আগুন

উৎসর্গ

পিতৃদেবতার চরণোদ্দেশে

লাভপুর, বীরভূম
মহালয়া, ১৩৪৪

এক

সার্কুলার রোডের সমাধিক্ষেত্র হইতে বাহির হইয়া চন্দ্রনাথের কথাই ভাবিতে ভাবিতে বাড়ি ফিরিলাম। কত কথা মনে হইতেছে! দীর্ঘ এত দিনের জীবন-ইতিহাসের মধ্যে কয়টি পৃষ্ঠায় চন্দ্রনাথ গভীর রাত্রির মধ্যগগনচারী কালপুরুষ নক্ষত্রের মত দীপ্তিতে পরিধিতে প্রদীপ্ত ও প্রধান হইয়া আছে। কালপুরুষ নক্ষত্রের সঙ্গে চন্দ্রনাথের তুলনা করিয়া আমার আনন্দ হয়। ঐ নক্ষত্রটির খড়্গধারী ভীমকায় আকৃতির সঙ্গে চন্দ্রনাথের আকৃতির যেন একটা সাদৃশ্য আছে। এমনই দৃপ্ত ভঙ্গিতে সেও আপনার জীবনের কক্ষপথে চলিয়াছে, একদিন পিছনে ফিরিয়া চাহিল না, ক্ষণিক বিশ্রাম করিল না, যাহাকে কুক্ষিগত করিবার অভিপ্রায়ে তাহার এ উন্মত্ত যাত্রা তাহাকে আজও পাইল না, তবু সে চলিয়াছে।

সঙ্গে সঙ্গে আরও একজনকে মনে পড়িতেছে—হীরুকে।

চন্দ্রনাথ, হীরু, আমি সহপাঠী। আরও একজনকে মনে পড়িতেছে—চন্দ্রনাথের দাদা নিশানাথবাবুকে। কেমন করিয়া যে এই তিনজন একই সময়ে ক্ষুদ্র একটি গ্রামের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছিলাম বলিতে পারি না, কিন্তু বিস্ময় প্রকাশ করিব না। আগ্নেয়গিরি গর্ভের মধ্যে কল্পনাতীত বিচিত্র সমাবেশে যত কিছু প্রলয়ঙ্কর দাহ্য বস্তু সমাবিষ্ট হয় কি করিয়া! এও হয়তো সেই বিচিত্র সমাবেশ।

ঘরে কেহ নাই। টেবিলের উপর টেবিল-ল্যাম্পটা অকম্পিত প্রদীপ্ত জ্যোতিতে জ্বলিতেছে। আলোকিত কক্ষের মধ্যে একা বসিয়া চন্দ্রনাথ, হীরু ও নিশানাথকে ভাবিতেছি। সম্মুখেই দেওয়ালে বিলম্বিত বড় আয়নাটির মধ্যে আমারই প্রতিবিম্ব আমার দিকে চিন্তাকুল নেত্রে চাহিয়া বসিয়া আছে। অলীক কায়াময় ছায়া, তবু সে আমার এই স্মৃতি-স্মরণে বাধা দিয়া তাহারই দিকে আমাকে আকর্ষণ করিতেছে। আলোটা নিভাইয়া দিলাম। মুহূর্তে ঘরখানা প্রগাঢ় অন্ধকারে ভরিয়া উঠিল।

অতীতের রূপ এই অন্ধকার। আলোকিত যে দিবসটি অবসান হইয়া তমসা-পারাবারের মধ্যে ডুব দিল, আর সে তো আলোকিত প্রত্যক্ষের মধ্যে ফেরে না। তাই অন্ধকারের মধ্যে তাহাকে খুঁজিতেছি। সে দেখা দিল। অন্ধকারের মধ্যে সুস্পষ্ট রূপ পরিগ্রহ করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল কিশোর চন্দ্রনাথ। দীর্ঘাকৃতি সবল সুস্থদেহ নির্ভীকদৃষ্টি কিশোর। অসাধারণ তাহার মুখাকৃতি; প্রথমেই চোখে পড়ে চন্দ্রনাথের অদ্ভুত মোটা নাক; সামান্য মাত্র চাঞ্চল্যেই নাসিকাপ্রান্ত স্ফীত হইয়া ওঠে। বড় বড় চোখ, চওড়া কপাল, আর সেই কপালে ঠিক মধ্যস্থলে শিরায় রচিত এক ত্রিশূল-চিহ্ন। এই কিশোর বয়সেও চন্দ্রনাথের ললাটে শিরার চিহ্ন দেখা যায়। সামান্য উত্তেজনায় রক্তের চাপ ঈষৎ প্রবল হইলেই নাকের ঠিক উপরেই মধ্য-ললাটের ওই ত্রিশূল-চিহ্ন মোটা হইয়া ফুলিয়া ওঠে।

সঙ্গে সঙ্গে হেডমাস্টার মহাশয়কে মনে পড়িতেছে। শীর্ণ দীর্ঘকায় শান্তপ্রকৃতির মানুষটি—ওই যে বোর্ডিঙের ফটকের সম্মুখেই চেয়ার-বেঞ্চের আসর পাতিয়া বসিয়া আছেন। হুঁকাটি হাতে ধরাই আছে। চিন্তাকুল বিমর্ষ নেত্রে আমাকে বলিলেন—নরু, তুমি একবার জেনে এস তো চন্দ্রনাথ কি বলে!

দুর্দান্ত চন্দ্রনাথের আঘাতে সমস্ত স্কুলটা চঞ্চল, বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে। প্রাইজ

ডিস্ট্রিবিউশনের সময়; চন্দ্রনাথ প্রাইজ প্রত্যাখ্যান করিয়া পত্র দিয়াছে। সেকেণ্ড প্রাইজ সে গ্রহণ করিতে চায় না। সে আজ পর্যন্ত কখনও সেকেণ্ড হয় নাই। তাঁহার কথা অবহেলা করিতে পারিলাম না। যদিও তখন আমাদের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে, স্কুলের সহিত বিশেষ সম্বন্ধ নাই, তবুও ওই স্নেহময় মানুষটিকে লঙ্ঘন করিবার শক্তি আমার নাই, প্রবৃত্তিও নাই। স্মৃতি স্মরণ করিতে বসিয়া এই অতীত মুহূর্ত বর্তমান হইয়া উঠিয়াছে, নতুবা আজও প্রত্যক্ষ বর্তমানে, দীর্ঘ কত বৎসর পরেও, মাস্টার মহাশয় এক এক-দিন স্বপ্নে আসিয়া পড়া ধরেন, মৃদু তিরস্কার করেন, আমি ভয় পাই। আবার কত দিন হাসিমুখে প্রসন্ন উৎসাহে আশীর্বাদ করিয়া যান, মনে বল পাই। যাক, প্রত্যক্ষ বর্তমানকে ভবিষ্যতের অন্ধকারের মধ্যেই রাখিয়া দিতে হইবে, মন মন্থন করিয়া অতীত বর্তমান হইয়া এই পরম নির্জন অন্ধকারের মধ্যে ফুটিয়া উঠুক।

চন্দ্রনাথের কাছেই গেলাম। দারিদ্র্য-জীর্ণ স্বল্পালোকিত চন্দ্রনাথের ঘরখানার মধ্যে চন্দ্রনাথ বসিয়া আপন মনে কি লিখিতেছিল। তাহার কাছে গিয়া দাঁড়াইলাম। সে লিখিতেই থাকিল, কোন অভ্যর্থনা করিল না; সে তাহার স্বভাব নয়। আমি নিজেই বসিয়া প্রশ্ন করিলাম, কি লিখছিস?

লিখিতে-লিখিতেই চন্দ্রনাথ উত্তর দিল, ইউনিভারসিটি একজামিনের রেজাল্ট তৈরি করছি। কে কত নম্বর পাবে তাই দেখছি।

তাহার কথা শুনিয়া আশ্চর্য হইয়া গেলাম। চন্দ্রনাথ আরও খানিকটা লিখিয়া কাগজখানা আমার সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া বলিল, দেখ।

কাগজটায় চোখ বুলাইতেছিলাম। চন্দ্রনাথ বলিতেছিল, আমার যদি সাড়ে-পাঁচ-শো কি তার বেশি ওঠে, তবে স্কুলের এই রেজাল্ট হবে—মানে দুটো ফেল, অমিয় আর শ্যামা; তা ছাড়া সব পাস হবে। আর আমার যদি পাঁচ-শো-পঁচিশের নীচে হয়, তবে দশটা ফেল; তুই তা হ'লে থার্ড ডিভিশনে যাবি।

বেশ মনে পড়িতেছে, তাহার কথা শুনিয়া রাগ হইয়াছিল। এই দাম্ভিকটা যেন ফেল হয় —এ কামনাও বোধ হয় করিয়াছিলাম।

চন্দ্রনাথ হাসিয়া বলিল, তুই বোধ হয় রাগ করছিস? কিন্তু অনুপাতের আঙ্কিক নিয়মে যার মূল্য যতবার ক'ষে দেখবে, একই হবে। একের মূল্য কমে, সকলের মূল্য কমবে। দিস ইজ ম্যাথ্‌ম্যাটিক্‌স।

আমি এইবার কথাটা পাড়িব ভাবিতেছিলাম, কিন্তু সে হইল না। চন্দ্রনাথের দাদা একখানা পত্র হাতে আসিয়া দাঁড়াইলেন, চন্দ্রনাথের হাতে পত্রখানা দিয়া বলিলেন, এ কি!

পত্রখানার উপর দৃষ্টি বুলাইয়া চন্দ্রনাথ অসঙ্কোচে বলিল, আমি সেকেণ্ড প্রাইজ রিফিউজ করেছি।

কারণ?

কারণ? চন্দ্রনাথের নাসিকাপ্রান্ত স্ফীত হইয়া উঠিল, ললাটে শিরায় রচিত ত্রিশূল-চিহ্ন ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করিতেছিল। এক মুহূর্ত স্তব্ধ থাকিয়া সে বলিল—কারণ, সেকেণ্ড প্রাইজ নেওয়া আমি বিনীথ মাই ডিগ্‌নিটি ব'লে মনে করি।

চন্দ্রনাথের দাদা ক্ষোভে যেন কাঁপিতেছিলেন, বহুকষ্টে আত্মসম্বরণ করিয়া তিনি বলিলেন, কথাটা বলতে তোমার লজ্জায় বাধল না? ডিগ্‌নিটি! একে তুমি ডিগ্‌নিটি বল? তোমার

অক্ষমতার অপরাধ!

বাধা দিয়া চন্দ্রনাথ বলিল, তুমি জান না দাদা।

কি জানি না? জানবার এতে আছে কি?

স্কুলের সেক্রেটারির ভাইপো ফার্স্ট হয়েছে, সে আমারই সাহায্যে হয়েছে। আর ওর যে প্রাইভেট মাস্টার—স্কুলের অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার—তিনি, কি বলব, প্রশ্নপত্র ছাত্রটির কাছে গোপন রাখেননি। তারও ওপর উত্তর বিচারের সময় ইচ্ছাকৃত ভুলও করেছেন তিনি এবং আরও দু'একজন।

চন্দ্রনাথের দাদার মুখ দিয়া কথা সরিতেছিল না। ভদ্রলোক নির্বিরোধী শান্তপ্রকৃতির মানুষ। তিনি অবাক হইয়া চন্দ্রনাথের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। চন্দ্রনাথ বলিল, অঙ্কের পরীক্ষার দিন সে আমায় মিনতি করলে, আমি তাকে তিনটে অঙ্ক আমার খাতা থেকে টুকতে দিলাম। মাস্টার পূর্বে ব'লে দেওয়া সত্ত্বেও সে সময় তার মনে ছিল না। আর বাংলা বা ইংরেজীতে যে সে ফার্স্ট হয়েছে—সে তো বললাম, ক'জন মাস্টারের ইংরেজীতে ইচ্ছাকৃত ভুল, কিংবা তাঁদের অক্ষমতা, ভাল মন্দ বিচার করতে পারেননি তাঁরা।

চন্দ্রনাথের দাদা বলিলেন, তার মানে, তুমি বলতে চাও যে, মাস্টারদের চেয়েও বাংলা ইংরেজীতে তুমি বড় পণ্ডিত, তোমাকে তাঁরা বুঝতে পারেননি?

চন্দ্রনাথ বলিল, সম্ভবত। আরও একটা কথা শোন, আমি এখানে কারও পেছনে প'ড়ে থাকতে পারি না। ওই ধনীর দুলালটির স্থান যোগ্যতা-হিসাবে আমার চেয়ে নীচে।

চন্দ্রনাথের দাদা গম্ভীর এবং ধীর কণ্ঠস্বরে বলিলেন, তোমার সঙ্গে তর্ক করে ফল নেই। তুমি ঐ পত্র প্রত্যাহার ক'রে ক্ষমা চেয়ে হেডমাস্টার মহাশয়কে পত্র লেখ, বুঝলে?

চন্দ্রনাথ বলিল, না।

কঠোরতর-স্বরে চন্দ্রনাথের দাদা বলিলেন, তোমায় করতে হবে।

না।

না? চন্দ্রনাথের দাদা যেন বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গেলেন এবার।

না।

করবে না?—ভদ্রলোকের কণ্ঠস্বর এবার কাঁপিতেছিল।

না।

কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া চন্দ্রনাথের দাদা বলিলেন, তোমার বউদি বলত, আমি বিশ্বাস করিনি, কিন্তু তুমি এতদূর স্বাধীন হয়েছ? ভাল, আজ থেকে তোমার সঙ্গে আমার আর কোন সংস্রব রইল না। আজ থেকে আমরা পৃথক।

অবিচলিত কণ্ঠস্বরে চন্দ্রনাথ বলিল, বেশ।

চন্দ্রনাথের দাদা নতশিরে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তিনি নিশ্চয়ই এ উত্তর প্রত্যাশা করেন নাই, বিশেষ এমন সংযত নিরুচ্ছ্বসিত কণ্ঠের উত্তর। আমি বেশ বুঝিলাম, ভদ্রলোক আত্মসম্বরণের জন্য বিপুল প্রয়াস করিতেছেন। দাঁতে ঠোঁট কামড়াইয়া তিনি দাঁড়াইয়া ছিলেন, চোখের দৃষ্টিতে বেদনা ও ক্রোধের সে এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ। এমন বুকে দাগ কাটা দৃষ্টি আমার জীবনে আমি খুব কমই দেখিয়াছি। এক মুহূর্তেও যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি। দাদা মুখ তুলিয়া সম্মুখের জানালার ভিতর দিয়া আখড়ার তমালগাছটার দিকে চাহিলেন। কাকের কোলাহল চলিয়াছে সেখানে, তাঁহাকে দেখিয়া আমার বড় কষ্ট হইল। আজও এই অন্ধকারের মধ্যে আমি চোখ মুদিলাম।

চিত্ত ক্রমশ ব্যথিত হইয়া উঠিতেছে। চন্দ্রনাথের দাদা ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। আমিও উঠিবার জন্ত সুযোগ খুঁজিতেছিলাম, বলিলাম, আমি যাই চন্দ্রনাথ।

চন্দ্রনাথ অপরিবর্তিত স্বাভাবিক কণ্ঠস্বরে বলিল, আচ্ছা।

চন্দ্রনাথের ঘর হইতে বাহির হইয়া বাড়ির উঠানে দাঁড়াইয়া নিশানাথবাবুর সন্ধানে চারিদিকে চাহিলাম, কিন্তু দেখিতে পাইলাম না। নিশানাথবাবুর স্ত্রী রান্নাঘরের দাওয়ায় বসিয়া রান্না করিতে করিতে আপন মনেই বকিতেছিলেন, ধন্য মানুষ বাবা, এমন সাধু-মহাত্মার চরণে প্রণাম। রাগ হ'ল তো জপে বসলেন, দুঃখ হ'ল তো জপে বসলেন, কোন একটা সুখের খবর এল তো জপে বসলেন! এসব মানুষের ঘরসংসার করতে নেই, বনে গিয়ে তপস্যাই করতে হয় মুনি-ঋষির মতো।

বুঝিলাম নিশানাথবাবু জপে বসিয়াছেন। নিশানাথ ঐ এক বিচিত্র ধারার মানুষ। ধর্মে অপরিসীম নিষ্ঠা, ক্রোধ দুঃখ এমন কি কোন আনন্দের অনুভূতি প্রবল হইলেও নিশানাথ তাঁহার ঠাকুর-ঘরে গিয়া জপে বসেন।

মনে-মনে তাঁহাকে প্রণাম করিয়াই বাড়ি হইতে বাহির হইয়া আসিলাম।

বোর্ডিঙে আসিয়া মাস্টার মহাশয়কে সংবাদটা দিতে গিয়া দেখিলাম, তিনি তখনও সেই তেমনই একা চিন্তাকুল নেত্রে বসিয়া আছেন। আমাকে দেখিবামাত্র বলিলেন, কি হ'ল নরু, সে কি বললে?

তাঁহাকে অকপটেই সমস্ত বলিলাম। তিনি হুঁকাটি হাতে ধরিয়াই নীরবে বসিয়া রহিলেন। অকস্মাৎ ডাকিলেন, কেষ্ট, কেষ্ট!

কেষ্ট বোর্ডিঙের চাকর। কেষ্ট আসিয়া দাঁড়াইল, মাস্টার মহাশয় বলিলেন, আর একবার তামাক দাও তো।

এই তো এখুনি দিলাম।—বলিয়া কেষ্ট কল্কেটা লইয়া ফু দিতে আরম্ভ করিল। তামাকের সুগন্ধে স্থানটা ভরিয়া উঠিল। বৃদ্ধের ধূমপানে বিলাস ছিল। কেষ্ট আবার হুঁকাটি তাঁহার হাতে ধরাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। মাস্টার মহাশয় তামাক টানিতে টানিতে বলিলেন, আমি একবার যাব নরেশ? কি বল তুমি? চন্দ্রনাথের কাছে? না না, পৃথক হবে কেন? নাঃ, ছি!

আমি বলিলাম, না স্যার, আপনি যাবেন না। যদি কথা না শোনে?

শুনবে না, আমার কথা শুনবে না? মাস্টার মহাশয়ের কণ্ঠস্বর উত্তেজিত হইয়া উঠিল। আমি উত্তর দিলাম না, নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

কিছুক্ষণ পরে মাস্টার মহাশয় বলিলেন, আমারই অন্যায় হ'ল চন্দ্রনাথের দাদাকে না জানালেই হ'ত। না, ছি ছি ছি!

আমি চলিয়া আসিতেছিলাম, তিনি আবার ডাকিলেন, তুমি বলছ নরেশ, আমার যাওয়া ঠিক হবে না, চন্দ্রনাথ আমার কথা শুনবে না?

আমি নীরবেই কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম, তারপর ধীরে ধীরে চলিয়া আসিলাম।

দিন দুই পর শুনিলাম চন্দ্রনাথ সত্যই দাদার সহিত পৃথক হইয়াছে। চন্দ্রনাথের সহিত দেখা করিলাম, সে বলিল, পৃথক মানে কি? সম্পত্তি তো কিছুই ছিল না, মাত্র বাড়িখানা আর বিঘে কয় জমি, কিছু বাসন। সে ভাগ হয়ে গেল। আমাকে তো এইবার নিজের পায়ে দাঁড়াতেই হ'ত, এ ভালই হ'ল।

আমি চুপ করিয়া রহিলাম। বোধ হয় সেদিন সে সময়ে ভাবিয়াছিলাম, চন্দ্রনাথের সহিত

সংস্রব রাখিব না। মনে মনে সংকল্পটা দৃঢ় করিতেছিলাম।

চন্দ্রনাথ হাসিয়া বলিল, হীরু এসেছিল আজ আমার কাছে। বলে, কাকা বলছেন তোমাকে তিনি একটা স্পেশাল প্রাইজ দেবেন।

হীরুই সেবার ফার্স্ট হইয়াছিল—আমাদের স্কুলের সেক্রেটারির ভাইপো।

আমি প্রশ্ন করিলাম, কি বললি তুই ?

চন্দ্রনাথ বলিল, তার কাকাকে ধন্যবাদ দিয়ে পাঠালাম, আর ব'লে দিলাম, একান্ত দুঃখিত আমি, স্নে গ্রহণ করতে আমি পারি না। এই প্রস্তাবই আমার পক্ষে অপমানজনক।

চন্দ্রনাথের মুখের দিকেই চাহিয়াছিলাম। সে আবার বলিল, হেডমাস্টার মশায়ও ডেকে পাঠিয়েছিলেন। তাঁকেও উত্তর দিয়ে দিলাম, গুরুদক্ষিণার যুগ আর নেই। স্কুলের সঙ্গে দেনা-পাওনা আমার মিটে আছে, দু'তিন মাসের মাইনে বাড়তি দিয়ে এসেছি আমি। সুতরাং যাওয়ার প্রয়োজন নেই আমার।

সেই মুহূর্তে উঠিয়া আসিলাম।

দুই

ইহার পরই আমি চলিয়া গেলাম মামার বাড়ি। পরীক্ষার খবর বাহির হইলে হীরুর পত্র পাইয়া কিন্তু অবাক হইয়া গেলাম, চন্দ্রনাথের অনুমান অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়া গিয়াছে। হীরু কলিকাতা হইতে দীর্ঘ পত্রে সমস্ত ফলাফল জানাইয়াছে। দেখিলাম, দশটি ছেলে ফেল হইয়াছে, আমি তৃতীয় বিভাগেই কোনরূপে পাস হইয়া গিয়াছি, চন্দ্রনাথও পাঁচ-শো-পঁচিশ পায় নাই। কিন্তু একটি শুধু মেলে নাই—হীরু চন্দ্রনাথকে পিছনে ফেলিয়া গিয়াছে। হীরু লিখিয়াছে, সে স্কলারশিপ্ পাইবে। মনে মনে দুঃখিত না হইয়া পারিলাম না, সত্য বলিতে কি, চন্দ্রনাথ ও হীরুতে অনেক প্রভেদ! চন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠত্বে আমার অন্তত সন্দেহ ছিল না। অপরাহ্নে পাঁচটার ট্রেনে মামার বাড়ি হইতে ফিরিয়াই সঙ্গে সঙ্গে হীরুর বাড়িতে প্রীতি-ভোজনের নিমন্ত্রণ পাইলাম। হীরু স্কলারশিপ পাইবে, তাহারই প্রীতি-ভোজ।

আমি কিন্তু প্রথমেই গেলাম চন্দ্রনাথের বাড়ি। নির্জন বাড়িখানা খাঁ খাঁ করিতেছিল। কেহ কোথাও নাই, শয়নঘরখানারও দুয়ার বন্ধ, কড়ায় একটা অতি সামান্য দামের তালা ঝুলিতেছে।

অল্পদিন-পূর্বে-অর্ধবিভক্ত বাড়িখানার মধ্যের প্রাচীরের ওপাশে নিশানাথবাবুর ছেলেমেয়েরা কাঁদিতেছে। কে যেন কিছু একটা কঠিন বস্তু দিয়া কোন ধাতুপাত্রে ঘর্ষণ করিতেছে। কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া ঘুরিয়া নিশানাথবাবুর বাড়িতে গিয়া উঠিলাম। নিশানাথবাবুর স্ত্রী একখানা ঝামা ইঁট একটা পোড়া কড়াইয়ের উপর সজোরে ঘষিতেছিলেন। আমি গিয়া দাঁড়াইতেই বলিলেন, এস ভাই, নরু ঠাকুরপো এস। বন্ধুটি চ'লে গেল, তোমার সঙ্গে বোধ হয় দেখা হয়নি ?

সবিস্ময়ে বলিলাম, চ'লে গেল! কে? চন্দ্রনাথ ? কোথায় ?

বউদিদি বলিলেন, কি জানি ভাই, তার অর্ধেক কথাই তো আমরা বুঝতে পারি না। তবে তার জমি-ঘর-বাসনপত্র সব বেচে ফেলে এখান থেকে আজই দুপুরে চ'লে গেল। কি

সব বললে—আহা, কথাটি বেশ! হ্যাঁ—বিশাল সংসার—নিজেকে প্রতিষ্ঠা—; দাঁড়াও হ্যাঁ—তারই মণিমন্দির গড়তে হবে। তার দাদাকে গিয়ে জিজ্ঞাসা কর বরং, সব শুনতে পাবে।—বলিয়া কড়ার উপর ঝামাটা আবার সজোরে ঘষিতে আরম্ভ করিলেন।

আবার ঝামা ঘষা বন্ধ করিয়া বলিলেন, আমার অদৃষ্টের কথা ব'ল না ভাই, এ অদৃষ্ট যেন বিধাতাপুরুষ নিরালায় ব'সে গড়েছিলেন। চন্দ্রনাথ যদি চ'লে গেল তো ইনি সেই যে জপে বসলেন ওবেলায়, এবেলা পর্যন্ত এখনও উঠলেন না।

নিশানাথবাবু জপে বসিয়াছেন! একবার ইচ্ছা হইল, তাঁহার ধ্যানমগ্ন মূর্তিখানি দেখি। দিব্যচক্ষু থাকিলে দেখিতাম, তাঁহার মনশ্চক্ষুর সম্মুখে কে—ঈশ্বর, না চন্দ্রনাথ!

বউদিদি বলিলেন, তাঁহার কণ্ঠস্বরে অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটিয়া গেল, বলিলেন—নরু, আমাদের বউ-জাতটারই এই অদৃষ্ট, বুঝেছ! দেবর যেন আমাদের চক্ষুশূল ছাড়া, আর কিছু হয় না। দেবর দেশত্যাগী হ'লে বউদিদির যেন আনন্দ হতেই হবে।

চন্দ্রনাথের বউদি চন্দ্রনাথকে প্রীতির চক্ষে দেখিতেন না, কিন্তু তাঁহার সেদিনের বেদনা কৃত্রিম নয়, আমার মনকে সে বেদনা স্পর্শ করিয়াছিল।

সন্ধ্যায় হীরুর বাড়ি গেলাম। উৎসবের বিপুল সমারোহ সেখানে। হীরু ধনীর সন্তান, অর্থের অভাব নাই; চীনা লণ্ঠন ও রঙিন কাগজের মালার নিপুণ বিন্যাসে তাহাদের বাড়ির পাশের আম-বাগানটার সে শোভা আজও আমার মনে আছে। হীরুর কাকা সৌখিন ধনীসন্তান বলিয়া জেলার মধ্যে খ্যাতি ছিল, তিনি নিজে সেদিন বাগানটাকে সাজাইয়াছিলেন। বিশিষ্ট অতিথিও অনেক ছিলেন, জনদুয়েক ডেপুটি, ডি. এস. পি. স্থানীয় সাব-রেজিস্ট্রার, থানার দারোগা, তাহা ছাড়া গ্রামস্থ ব্রাহ্মণ কায়স্থ ভদ্রলোকজন সকলেই প্রায় উপস্থিত ছিলেন।

হীরুকে স্পষ্ট মনে পড়িতেছে, লাবণ্যময় দেহ, আয়ত কোমল চোখে মোহময় দৃষ্টি। হীরুর কথা মনে করিয়া আকাশের দিকে চাহিলে, মনে পড়ে শুকতারা। অমনই প্রদীপ্ত, কিন্তু সে দীপ্তি কোমল স্নিগ্ধ।

হীরু পরম সমাদর করিয়া আমাকে বসাইল। নানা কথার মধ্যে সে বলিল, কাকা বলছিলেন, এখন থেকে আই. সি. এস.-এর জন্যে তৈরী হও। বিলেতে যেতে হবে আমাকে। বিলেতে যাবার আমার বড় সাধ, নরু।

আমার কিন্তু বারবার মনে পড়িতেছিল চন্দ্রনাথকে। কিন্তু সেদিন সেখানে তাহার কথা আমি তুলিতে পারি নাই। হীরুই বলিল, আজই দুপুরে সে চ'লে গেল। আমি তার আগেই তাকে নেমন্তন্ন করেছিলাম, তবুও সে চ'লে গেল! একটা দিন থেকে গেলে কি হ'ত?

চকিতে একটা কথা আমার মনে পড়িয়া গেল, বলিলাম, চন্দ্রনাথের দাদাকেও তো কই দেখছি না, তিনি—তাঁকে কি—

প্রশ্নটা যে কি, সে হীরু বুঝিয়াছিল। সে বুদ্ধিমান ছেলে, বলিল, বলা নিশ্চয়ই হয়েছে তাঁকে। গ্রামের প্রত্যেক লোকের নাম ধ'রে নেমন্তন্ন করা হয়েছে। তিনি আসেননি। কাল কাঙালী—মানে আমাদের গ্রামের কাঙালীদের খাওয়ান হবে কিম্বা একখানা ক'রে কাপড় দেওয়া হবে।

আমি ভাবিতেছিলাম চন্দ্রনাথের দাদার কথা। চন্দ্রনাথের আচরণের লজ্জাই কি আজ তাঁহাকে আসিতে দেয় নাই, না চন্দ্রনাথের ব্যর্থতার বেদনা তাঁহাতে সংক্রামিত হইয়া তাঁহাকে

পঙ্গু করিয়া তুলিয়াছে ? এখনও কি তিনি জপে নিযুক্ত ?

হীরু বলিল, মাস্টার মশায়—মাস্টার মশায় ।

সচেতন হইয়া মুখ ফিরাইয়া দেখিলাম, শীর্ণকায় দীর্ঘাকার মানুষটি এণ্ডির চাদরখানি গায়ে দিয়া আমাদের দিকেই আসিতেছেন। আমরা উঠিয়া দাঁড়াইলাম।

হাসিয়া মাস্টার মহাশয় বলিলেন, আজই এলে নরেশ ?

মাস্টার মহাশয়ের ওইটুকু এক বিশেষত্ব, ছাত্র তাঁহার অধিকারের গণ্ডি পার হইলেই সে আর 'তুই' নয়, তখন সে 'তুমি' হইয়া যায় তাঁহার কাছে।

তিনি আবার বলিলেন, তুমি পড়বে নিশ্চয় নরেশ। কিন্তু সাহিত্য-চর্চাটা পড়ার সময় একটু কম ক'র বাবা। তবে ছেড়ো না, ও একটা বড় জিনিস। জেনো, Shame in crowd but solitary pride হওয়াই উচিত ও বস্তু।

আমি চুপ করিয়া থাকিলাম। হীরু বলিল, নরুর লেখা যে কাগজে বেরিয়েছে এবার স্যার।

হ্যাঁ ? বেশ, বেশ। আমাকে লেখাটা দেখাবে তো নরেশ, পড়ব আমি।

তারপর আমাকে প্রশ্ন করিলেন, চন্দ্রনাথ কোথায় গেল, কাউকে ব'লে গেল না? তোমাকেও কি কিছু জানিয়ে যায়নি—পত্র-টত্র লিখে ?

বলিলাম, না স্যার, কাউকেই সে কিছু জানিয়ে যায়নি।

লাঠির উপর ভর দিয়া মাস্টার মহাশয় কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন, কি যেন তিনি চিন্তা করিতেছিলেন। আমরাও নীরব।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মাস্টার মহাশয় নীরবেই চলিয়া গেলেন, আমরা আবার বসিলাম।

হীরু বলিল, চন্দ্রনাথ একখানা চিঠি দিয়ে গেছে। দেখবি ?

চিঠিখানা দেখিলাম, সে লিখিয়াছে—

প্রিয়বরেষু, (প্রিয়বরেষু কাটিয়া লিখিয়াছে) প্রীতিভাজনেষু,

আজই আমার যাত্রার দিন, সুতরাং থাকিবার উপায় নাই, আমাকে মার্জনা করিও। তোমার সফলতায় আনন্দ প্রকাশ করিতেছি। কিন্তু একটা কথা বারবার মনে হইতেছে, এ উৎসবটা না করিলেই পারিতে। স্কলারশিপটা কি এমন বড় জিনিস! ভালবাসা জানিবে। ইতি—

চন্দ্রনাথ

চিঠিখানা হীরুকে ফিরাইয়া দিলাম। হীরু বলিল, চিঠিখানা রেখে দিলাম আমি। থাক, এইটেই আমার কাছে তার স্মৃতি-চিহ্ন।

সে আবার প্রশ্ন করিল, আচ্ছা, কোথায় গেল সে ? করবেই বা কি ?

সে যেন নিজেও এ কথা চিন্তা করিয়া দেখিতেছিল!

উত্তর দিয়াছিলাম, জানি না।

কিন্তু কল্পনা করিয়াছিলাম, কিশোর চন্দ্রনাথ কাঁধে লাঠির প্রান্তে পোঁটলা বাঁধিয়া সেই রাত্রেই জনহীন পথে একা চলিয়াছে। দুই পাশে ধীর মন্থর গতিতে প্রান্তর যেন পিছনের দিকে চলিয়াছে, মাথার উপরে গভীর নীল আকাশে ছায়াপথ, পার্শ্বে কালপুরুষ নক্ষত্র সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছে।

* * *

অকস্মাৎ চিন্তাসূত্র ছিন্ন হইয়া গেল। মনোমধ্যের প্রিয়জন সব—যাহারা এই নির্জন

অন্ধকার ছায়াপথে কায়া গ্রহণ করিয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহারা মনোকন্দরে গিয়া লুকাইয়া বসিল।

চাকরটা দুয়ারে আঘাত করিয়া ডাকিতেছিল, বাবু, খাবার দেওয়া হয়েছে। মা ডাকছেন।

বিরক্তিভরে বলিলাম, নাঃ, খাব না আজ! বিরক্ত করিস নি আর।

ক্রমে আমার কণ্ঠধ্বনি অন্ধকারের তরঙ্গের মধ্যে ডুবিয়া গেল। ঘরের নির্জনতা আবার প্রগাঢ় হইয়া উঠিয়াছে।

স্ত্রী আসিয়া দুয়ারে আঘাত করিয়া বলিলেন, আজ কি সমস্ত রাত্রি কাজ করবে নাকি? তা না-হয় কর, কিন্তু খাবে না কেন?

উঠিয়া গিয়া বলিলাম, আজ আমায় মাফ কর।

তিনি বলিলেন, ধন্য মানুষ তুমি! খেলেও কি—

হাতজোড় করিয়া মার্জনা চাহিলাম, তিনি বোধ হয় অভিমান করিয়াই চলিয়া গেলেন। সেদিকে মনোযোগ দিবার প্রবৃত্তি ছিল না। ফিরিয়া আসিয়া ছিন্ন চিন্তার সূত্র আবার জোড়া দিতে বসিলাম।

হাঁ, হীরুদের বাগানে বসিয়া চন্দ্রনাথের কথা কল্পনা করিতেছিলাম। সে কল্পনা আমার অলীক নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে কল্পনায় আর বাস্তব সত্যে আশ্চর্যরূপে মিলিয়া যায়। মানুষের অন্তর্দৃষ্টি যেন বিধাতার খাতার মধ্যে প্রবেশাধিকার পায়। আমার মনশ্চক্ষুর দৃষ্টি সেদিন এই অধিকারই পাইয়াছিল। এই দিনটির বারো বৎসর পর একদিন চন্দ্রনাথ আমাকে বলিয়াছিল, সে রাত্রে আমি বিশ্রাম করিনি, সমস্ত রাত্রি হেঁটে চলেছিলাম। অন্ধকারের গাঢ়তা আমার দৃষ্টিশক্তির কাছে লঘু হয়ে গিয়েছিল। সমস্ত কিছু আমি বেশ দেখতে পাচ্ছিলাম। দু-ধারের প্রান্তর পেছনের দিকে চলছিল। অন্ধকার রাত্রি, অজানা পথ। মনে কিন্তু একবিন্দু ভয় ছিল না, দেহে ক্লান্তি অনুভব করিনি। সেদিনের মত মনের গতি একদিনও আর আমি অনুভব করলাম না, নরু। সে অন্ধকারের মধ্যে ঠিক যেন চোখের সামনে ভবিষ্যৎ আমাকে আহ্বান ক'রে নিয়ে চলেছিল।

যাক্, স্মৃতির সুরবিন্যাস ভাঙ্গিয়া যাইতেছে।

তিন

আবার সব মনে পড়িতেছে।

পরদিন প্রাতঃকালেই নিশানাথবাবুর ওখানে গেলাম। কৌতূহলকে অস্বীকার করিতে পারি না, কিন্তু তাঁহার মর্মলোকের বেদনা আমাকে সেদিন স্পর্শ করিয়াছিল, তাহা নিশ্চিত। নতুবা সঙ্কোচ আমার গতি রুদ্ধ করিত। অসঙ্কোচেই গিয়াছিলাম। নিশানাথবাবুর তখন স্নান এবং পূজা-উপাসনা শেষ হইয়া গিয়াছে। প্রসন্ন হাসিমুখেই আমাকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, এস, নরু এস। কাল তুমি এসেছিলে শুনলাম।

তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া আমার সব গোলমাল হইয়া গেল, অকস্মাৎ সঙ্কোচ যেন গুপ্ত শত্রুর মত অতর্কিতে চারিদিকে বেষ্টন করিয়া আক্রমণ করিল। বার বার শুধু মনে হইল,

কেন আসিলাম, না আসিলেই ছিল ভাল। নিশানাথবাবু নিজেই বলিলেন, চন্দ্রনাথ কালই চ'লে গেল, কোথায় যে গেল তাও ব'লে গেল না। হয়তো সেও ঠিক করতে পারেনি কোথায় যাবে। আর, কোথায় যে তার কর্ম্মস্থল, তা সেই কি জানে! তবু মনটা কাল বড় উতলা হয়ে পড়েছিল ভাই, সমস্ত দিন ভগবানকে ডেকেছি যে, মন আমার শান্ত ক'রে দাও দয়াময়। বহুকষ্টেই মন শান্ত হ'ল, তাই কি সম্পূর্ণরূপে শান্ত হয় মন! ভদ্রলোক একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া নীরব হইলেন। তারপর আবার বলিলেন, মনের চেয়ে বড় শত্রু মানুষের আর নেই। পৃথিবীর নশ্বরতার কথা মানুষের চেয়ে বেশি তো কোন প্রাণী বোঝে না, তবু তার চেয়ে শোকে বিহ্বল আর কোন জীব হয় না। নশ্বর সম্পদ দিয়ে শূন্যে প্রাসাদ রচনা করবার আকাঙ্ক্ষা মানুষেরই সব চেয়ে বেশি। অথচ নশ্বর তুচ্ছ সম্পদ দিয়ে যিনি মানুষকে ভুলিয়ে রেখেছেন, সেই অবিনশ্বরকে পাবার একটুকু আকাঙ্ক্ষা তার আছে? যুধিষ্ঠিরের 'কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্' উক্তির চেয়ে সত্য উক্তি আর কেউ কখনও করেনি।

আমার বিরক্তি বোধ হইতেছিল, ধর্মের বক্তৃতা শুনিবার প্রবৃত্তি তখন আমার ছিল না। কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া কেহ ফুল দেখিয়া গাছের মূলের কথা ভাবে না। মানুষ তখন দেখে ফুলের রূপ। অপরূপ যে রহস্যে বৃক্ষসঞ্চারী মৃত্তিকার রস বর্ণ-বৈচিত্র্যে সুরভিতে রূপকথার মায়াবিনীর মত মনোহারিণী হইয়া ওঠে, সে রহস্যের কথা চিন্তা করিবার তখন তাহার অবসর থাকে না। আমারও তখন সেই বয়স। চন্দ্রনাথের দেশত্যাগের বেদনাই তখন আমার নিকট প্রত্যক্ষ, সে বেদনাটা যে মায়া, এ কথা বুঝিতে তো প্রবৃত্তি ছিলই না, এমন কি শুনিতেও বিরক্তি বোধ হইতেছিল।

আমি কথাটা এড়াইয়া প্রশ্ন করিলাম, আপনি তাকে বারণ করলেই ভাল করতেন।

নিশানাথবাবু আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, ভাল করতাম বলছ নরু? কিন্তু—

তিনি নীরব হইয়া কি যেন চিন্তা করিতে লাগিলেন। আমি নীরবেই রহিলাম। নিশানাথবাবু আবার বলিলেন, না, আমার সে অধিকার ছিল না নরু। মনে কর, ভগবান, যিনি জীবকে সৃষ্টি করেন, তিনিও চেতনা-শক্তিতে জীবকে সচেতন ক'রে দেওয়ার পর আর জীবের ইচ্ছামত কর্মে কখনও নিষেধ করতে আসেন না। আমি চন্দ্রনাথকে সুস্থ সবল যুবায় পরিণত ক'রে দিয়েছি, তাকে যথাসাধ্য শিক্ষালাভে সাহায্য করেছি, এখন তার ইচ্ছামত কাজে বাধা দেবার বা নিষেধ করবার অধিকার আমার তো নেই।

অদ্ভুত মানুষ, পাগল ছাড়া কিছু বলা চলে না। কিন্তু পাগলের পাগলামির মধ্যে পড়িয়া আমি যেন হাঁপাইয়া উঠিতেছিলাম। নিশানাথবাবু নীরব হইতেই আমি উঠিয়া পড়িলাম, বলিলাম, আমি যাচ্ছি তা হ'লে এখন। চন্দ্রনাথের খবর পেলে আমাকে জানাবেন দয়া ক'রে।

তিনি বলিলেন, বেশ।

বাড়ির বাহিরে আসিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। নিশানাথবাবু তখন আপন মনে বেশ স্পষ্টকণ্ঠেই বলিতেছিলেন—

কা তব কান্তা কস্তে পুত্র।
সংসারোঽয়মতীব বিচিত্র॥

চন্দ্রনাথের জন্য বেদনা বোধ করিলাম, মনে মনে বলিলাম, হতভাগ্য চন্দ্রনাথ! বেশ

করিয়াছে সে চলিয়া গিয়াছে।

চন্দ্রনাথের সহিত যোগসূত্র চন্দ্রনাথই ছিন্ন করিয়া চলিয়া গিয়াছে। আবার এই সময়েই হীরু ও নিশানাথবাবুর সহিতও আমার যোগসূত্র ছিন্ন হইয়া গেল।

আমি পড়িতে চলিয়া গেলাম আমার মামার বাড়ির সুবিধায় পাটনায়। হীরু ভর্তি হইল কলিকাতায় প্রেসিডেন্সিতে। নিশানাথবাবু গ্রামেই ধ্রুবনক্ষত্রের চতুষ্পার্শ্ববর্তী ঋষিমণ্ডলের নক্ষত্রের মত আপন দেবতার তপস্যায় নিমগ্ন থাকিয়া গেলেন।

তারপর ?

আজ এই নির্জন ক্ষণে জীবনের প্রথম বৃহত্তর জগতের রসাস্বাদনের স্মৃতি মনে জাগিতেছে। কত আশা, কত কামনা! উঃ, সে আশা আকাঙ্ক্ষার আজ পরিমাণ করিতে গিয়া মনে হইতেছে—এত রাশি রাশি কামনা, কল্পনা আমার ক্ষুদ্র এতটুকু বুকের মধ্যে ধরিয়াছিল কেমন করিয়া! এ যে স্তূপীকৃত করিয়া সাজাইলে ধরিত্রীর বক্ষ হইতে আকাশ স্পর্শ করে; ধরণীর বক্ষময় বিস্তীর্ণ করিয়া দিলে ধরিত্রীবক্ষ আবৃত হইয়া যায়! লেখক হইব, কবি হইব! বেশ মনে পড়ে, কিশোর মনের গোপন আকাঙ্ক্ষার নিকট 'আজি হতে শত বর্ষ পরে' আকাঙ্ক্ষা তখন নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর, সে মনের আকাঙ্ক্ষা সেদিন 'আজি হতে লক্ষ বর্ষ পরে'। হয়তো লক্ষ বর্ষ পরের পৃথিবীর সৌধ-বাতায়নের পার্শ্বে মুগ্ধ বিভোর একখানি কিশোরীর মুখও কল্পনা-নেত্রের সম্মুখে প্রত্যক্ষ দেখিয়াছিলাম। আমার কণ্ঠের জয়মাল্য রচনা করিতে পৃথিবীর পুষ্পরাশি নিঃশেষিত হইয়া যাইতেও বোধ হয় দেখিয়াছি।

আজও বুক ফাটিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ঝরিয়া পড়িল। গোপন করিব না, এ দীর্ঘনিশ্বাস আশা-ভঙ্গের, ব্যর্থতার।

যাক, আজ আর নিজের কথা ভাবিব না, যাহাদের কথা স্মরণ করিতে বসিয়াছি, তাহাদিগকেই স্মরণ করিব। কই, কোথায় চন্দ্রনাথ, কোথায় হীরু, নিশানাথবাবুই বা কই ? স্মৃতির খাতা পাতার পর পাতা উল্টাইয়া চলিয়াছি, তাহাদের কাহাকেও পাইতেছি না। পূজার ছুটিতে বাড়ি গিয়াও কাহারও সহিত দেখা হইল না। চন্দ্রনাথ নিরুদ্দেশ, হীরু পূজাতেও বাড়ি আসে নাই, নিশানাথবাবু তীর্থভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। হীরুর মা মারা গিয়াছেন, তাহার পর হীরু আর বাড়ি আসে নাই। সপ্তমী-পূজার দিন বউদিদি, নিশানাথবাবুর স্ত্রীর সহিত দেখা হইল। প্রাতঃকাল। আগমনীর ঘট ভরিবার জন্য তখন শোভাযাত্রা বাহির হইয়াছে। দলে দলে বালক বৃদ্ধ যুবা বসনে-ভূষণে সুসজ্জিত হইয়া দেবীর নবপল্লব-বাহিত দোলার পিছনে চলিয়াছে। আমি তাড়াতাড়ি একটা গলিপথ ধরিয়া শোভাযাত্রার অভিমুখে চলিয়াছিলাম। গলিপথটার একটা বাঁক ঘুরিয়াই আমাকে থমকিয়া দাঁড়াইতে হইল। পথের ধুলায় একটি শিশু গড়াগড়ি দিয়া কাঁদিতেছিল। আর ছেলেটির দিকে নির্নিমেষ অদ্ভুত দৃষ্টিতে চাহিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন নিশানাথবাবুর স্ত্রী, পাথরের মূর্তির মুখের মত ভাবান্তরহীন মুখ, নিষ্পলক দৃষ্টি। ছেলেটিকে চিনিলাম—নিশানাথবাবুরই শিশুপুত্র।

ডাকিলাম, বউদি!

আহ্বানের শব্দে বৌদিদির যেন চেতনা ফিরিয়া আসিল, তিনি মুহূর্তে নিদারুণ কঠোর আকর্ষণে ছেলেটাকে মাটি হইতে টানিয়া তুলিয়া লইয়া দ্রুতপদে বাড়ির মধ্যে চলিয়া গেলেন। কিন্তু ছেলেটার মর্মভেদী চীৎকার থামিল না। সে চীৎকার করিয়া কাঁদিতেছিল, জামা নোব। শারদীয়া সপ্তমীর সমস্ত উৎসব যেন হীনপ্রভ হইয়া গেল, আমি সেখানেই দাঁড়াইয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ পর মন স্থির করিয়া ছুটিলাম দোকানে। একটা রঙিন সাটিনের জামা

লইয়া ফিরিয়া নিশানাথবাবুর বাড়ির দরজায় দাঁড়াইয়া সেটা ভিতরের দিকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া পলাইয়া আসিলাম।

বউদিদি কিন্তু বুঝিয়াছিলেন, কে এমন কাজ করিয়াছে। অপরাহ্ণে তিনি আমাদের বাড়ি আসিলেন, সঙ্গে সেই ছেলেটি, ছেলেটির গায়ে নীল সাটিনের জামাটি বড় সুন্দর মানাইয়াছিল। আমি লজ্জায় তাড়াতাড়ি পড়ার ঘরে ঢুকিয়া পড়িলাম। কিন্তু তাহাতেও নিস্তার পাইলাম না। কিছুক্ষণ পর তিনি নিজেই হাসিমুখে ঘরের মধ্যে আসিয়া বলিলেন, নরুর আজকাল বড় লজ্জা হয়েছে দেখছি!

তাঁহার প্রসন্ন কণ্ঠস্বরে আশ্বাস পাইয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলাম, ভাল আছেন বৌদি?

ভাল না থাকলে উপায় কি ভাই! বিধাতার যেন ঐটুকু বিবেচনা আছে দেখতে পাই। এর ওপরে রোগ থাকলে ছেলেগুলো সত্যি সত্যিই ম'রে যেত।

চন্দ্রনাথ কোন খবর-টবর দেয় নি বউদি?

বউদিদির চক্ষু সজল হইয়া উঠিল, তিনি বলিলেন, না। সেই যে গেল, আর কোন খবর নেই।

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন, এরা দুটি ভাই অদ্ভুত। মায়া নেই মমতা নেই, কেন যে এরা মাটির পৃথিবীতে এল, তাই এক-এক সময় ভাবি। তোমার দাদাকে কতবার বললাম, ওগো, খোঁজখবর কর। উত্তর কি জান? উত্তর হ'ল—এ সংসারে কে কার? সোনার হরিণের পেছনে ছুটতে গেলে সীতা-হরণ হতেই হবে। নিজের ছেলেপিলের ওপরেই যার মায়া নেই, তার কথাই ভিন্ন ঠাকুরপো।

চুপ করিয়া রহিলাম, কোন উত্তর খুঁজিয়া পাইলাম না। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বউদিদি বলিলেন, জামাটার কত দাম ভাই ঠাকুরপো? কোন রকম ক'রে দেব তোমায় আমি, কিন্তু সবুর ক'রে নিতে হবে?

আমি অস্বীকার করিতে পারিলাম না, বলিলাম, বেশ, তাই দেবেন। আর একটা কথা বউদি, যদি আর কিছু কাপড়-চোপড় দরকার হয়—। কথাটা শেষ করিতে পারিলাম না। বউদিদিও নীরবে স্থিরদৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। আমি শঙ্কিত হইয়া বলিলাম, দাম পরে দেবেন। আমি তো পর নই, যেন মনে কিছু করবেন না।

ম্লান হাসি হাসিয়া বউদিদি বলিলেন, না ভাই মনে কিছু করিনি। ভাবছিলাম, দেনা তো ঘাড়ে চাপবে।

না না, তার জন্যে ভাববেন না! সে যখন হোক দেবেন!

তা হ'লে ভাই, আমার জন্যে একখানা ধোলাই শাড়ি আর খুকীর জন্যে একটা জামা তুমি এনে দাও। কিন্তু দাম তোমায় নিতে হবে।

তখনই দোকানে বাহির হইয়া গেলাম। কাপড় পাইয়া বউদিদির মুখ আনন্দে উজ্জল হইয়া উঠিল, আনন্দে যেন তিনি বালিকার মত চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, দাঁড়াও ভাই ঠাকুরপো, কাপড়টা প'রে আসি, দেখ তো কেমন মানায়!

নববস্ত্রে সজ্জিতা বউদিদিকে সত্যই মানাইয়াছিল বড় চমৎকার, সুশ্যামা হৃষ্টপুষ্ট বউদিদিকে লালপেড়ে শাড়িতে যেন লক্ষ্মীঠাকরুণটির মত মনে হইতেছিল।

বলিলাম, চমৎকার মানিয়েছে বউদি, যেন লক্ষ্মীঠাকরুণটি।

খুশি হইয়া বউদিদি বলিলেন, ব'স ভাই, একটু জল খেয়ে যাও, পুজোর দিন।

নারিকেল-নাড়ু চিবাইতে চিবাইতে বলিলাম, দাদা কত দিন হ'ল বেরিয়েছেন, কবে

ফিরবেন ?

ভগবান খুঁজতে বেরিয়েছেন ভাই, কখন' ফিরবেন কেমন ক'রে বলব ? গেছেন ভাদ্র মাসে, ব'লে গেছেন ফিরবেন ফাল্গুন মাসে। কার্তিক মাসে হবে সংকল্প ক'রে গঙ্গাস্নান, মাঘ মাসে করবেন কল্পবাস। আবার আমার যা কপাল, যদি ভগবান মিলেই যায়, তবে হয়তো আর ফিরবেনই না।

সংকল্প করিলাম, নিশানাথবাবুর সহিত দেখা হইলে প্রশ্ন করিব, এই সৌরজগৎটা কত বড জানেন ? কল্পনা করতে পারেন ? কত কোটি সৌরজগৎ আবিষ্কৃত হয়েছে, আর কত কোটি এখনও অনাবিষ্কৃত, ধারণা করতে পারেন ?

সোনার হরিণ ! সোনার হরিণের পিছনে পিছনে যে নিজে উন্মাদের মত ছুটিয়াছে, সেও বলে— সোনার হরিণের পিছনে ছুটিও না !

বউদিদি আমার মনের মধ্যে কল্পনার কেন্দ্রস্থলে অপরূপ হইয়া দিন দিন উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিতেছিল। বউদিদিকে লইয়া কাহিনী রচনা করিবার ইচ্ছা দিন দিন প্রবল হইয়া উঠিতেছে। শস্যপরিপূর্ণা বসুন্ধরার মত মেয়েটির অবহেলিত জীবন, তাহার অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা, শস্যশীর্ষগুলির অপচয়ে অনাদরে তাহার নীরব বেদনা, ব্যর্থ রোষ—এই লইয়া কাহিনী রচনা করিব। একটি রচনাই আমাকে অমর করিয়া রাখিবে। লক্ষ্মীরূপিণী বউদিদি আমার জয়ধ্বজা মাথায় করিয়া গরবিনীর মত মনের মধ্যে দাঁড়াইয়া হাসেন। তাঁহার বেদনায় ধরণী বেদনাপ্লুতা হইবে।

* * *

মাঘ মাসের প্রথম সপ্তাহেই মামা বলিলেন, তুই একবার এলাহাবাদ থেকে ঘুরে আয় না দেখি। শ্যামার মেয়ের বিয়ে, তুই-ই এখান থেকে যা।

শ্যামা আমার মাসতুতো বোন। সানন্দেই রাজি হইলাম। দেশ-দেশান্তরে আমার কল্পনার পটভূমি বিস্তৃততর হইবে, এই কল্পনাতেই আনন্দের আমার সীমা রহিল না।

শ্যামাদিদির মেয়ের বিবাহের মধ্যে আবার এক বিচিত্র রূপ আমার চোখে পড়িল।

দেখিলাম, যাহার বিবাহ সে-ই এ আনন্দ-উৎসবের মধ্যে অবহেলিত, সে হইয়াছে গৌণ; মুখ্য হইয়াছে সংসারের প্রত্যেক জনটির আপন আপন আনন্দ কামনা। শ্যামাদিদির শাশুড়ী আপনার কন্যাদের লইয়া ব্যস্ত; কন্যারা ব্যস্ত আপন আপন সাজসজ্জা, ছেলেমেয়েদের সাজ-সজ্জা লইয়া। এক কন্যা দর্জিকে আপনার কন্যার ফ্রকের জন্য বরাত করিলেন—সে জামাটার কলার হইবে একজনের জামার মত, হাতের ফ্যাশান হইবে অন্য একটি জামার মত, গলা হইতে কোমর পর্যন্ত আর এক রকম, সেটুকু স্বাধীন কল্পনা। নিম্নভাগ হইবে আর একটি জামার মত। দর্জি অবাক হইয়া গেল। একদল মেয়ে রোশনচৌকির জন্য ব্যস্ত, একদল ব্যস্ত বাসরঘরের ব্যবস্থা লইয়া। বিধবারা আচার-আচরণ লইয়া ব্যস্ত। শ্যামাদিদির বড় ছেলে দুইটি মাকে অহরহ খোঁচাইতেছে, আমাদের জামা ভাল হ'ল না মা।

সকলের মধ্যে ভাবী বধূটি শুধু সকলের কাছে ধমক খাইয়া ফিরিতেছে।

বেদনা বোধ না করিয়া পারিলাম না। কিন্তু তবুও পুলকিত হইলাম, নতুন একটি কাহিনীর উপাদান পাইয়াছি।

কাহিনীটিকে গুছাইয়া লইবার জন্য সেদিন অপরাহ্ণে যমুনার ঘাটে আসিয়া একখানা নৌকা করিয়া ত্রিধারা সঙ্গমের দিকে বেড়াইতে গেলাম। তরঙ্গময়ী গঙ্গার শক্তির প্রতিরোধে

গভীর নীলসলিলা যমুনা ধীরে ধীরে বহিয়া চলিয়াছে। নৌকাখানা ধীরে ধীরেই ভাসিয়া চলিয়াছিল। সম্মুখে সঙ্গমস্থলের উপর বিশাল কেল্লা। একেবারে মাথার উপরে একটা বারান্দায় গোরা সৈন্যেরা ব্যাণ্ড বাজাইতেছিল। চিন্তাসূত্র ছিন্ন হইল, কেল্লার দিকেই ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিলাম। হিন্দুর প্রতিষ্ঠান দুর্গ, মুসলমানের এলাহিবাদ কেল্লা, ইংরেজের এলাহাবাদ ফোর্ট। সকলের চেয়ে ভাল লাগিল গঙ্গার ঘাটের উপর দুর্গ-প্রবেশের ঢালু পথটি ও ফটকটি। এ দুইটি মুসলমানদের রচনা। মনে পড়িতেছে, কয় লাইন কবিতাও যেন সেদিন রচনা করিয়াছিলাম—

ওই সে লৌহদ্বার,
বীর ছাড়া নাই কাপুরুষের প্রবেশেতে অধিকার।
হূনের আঘাত, পাঠানের অসি,
মোগলের ছুরি আছে হেথা বসি,
বর্গীরা ভীম বর্শা-আঘাত
হানিল বারংবার।

বাকিটা ভুলিয়া গিয়াছি, আর মনে পড়ে না। সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছিল, নৌকাটা ছাড়িয়া দিয়া গঙ্গার তীরভূমি ধরিয়া শহরের দিকে চলিতেছিলাম। রাস্তার দুই পাশে সাধু-সন্ন্যাসীদের কুঁড়েঘর; কেহ কেহ বা অনাবৃত সিক্ত বালুভূমির উপরেই খোলা গায়ে বসিয়া আছে। অদ্ভুত কৃচ্ছ্রসাধন!

কে, নরু না?

ঈষৎ বিস্মিত হইয়া চাহিয়া দেখি—নিশানাথবাবু। গঙ্গার তীরভূমির উপর ছোট একটি খড়ের কুঁড়ের মধ্যে খড় বিছাইয়া বসিয়া আছেন নিশানাথবাবু। বিশৃঙ্খল বড় বড় চুল-দাড়ি-গোঁফে মুখ ভরিয়া উঠিয়াছে।

তাড়াতাড়ি প্রণাম করিয়া বলিলাম, আপনি? কিন্তু এই ঠাণ্ডায় এখানে, এই গঙ্গার ধারে—আর এ কি চেহারা হয়েছে আপনার?

কল্পবাসের যে এই নিয়ম। কল্পবাস করছি কিনা। কামানো নিষেধ, তেল মাখতেও নেই, কাজেই—। বলিয়া তিনি একটু হাসিলেন।

ধাঁ করিয়া মনে পড়িয়া গেল বৌদিদির কথা, আমার মনের সংকল্পের কথা

বলিলাম, কিন্তু এ কি করছেন আপনি? আপনার ছেলে মেয়ে স্ত্রী—তাদের ব্যবস্থা কি ক'রে এসেছেন?

হাসিয়া উপরের দিকে হাত তুলিয়া নিশানাথবাবু কহিলেন, ব্যবস্থার মালিক যিনি, তিনিই করবেন নরু। আমি যদি ম'রে যাই—

ঈষৎ রূঢ়ভাবেই বলিলাম, ম'রে তো যাননি।

না, যাইনি। কিন্তু তাতেও প্রভেদ কিছু হয় না। কারণ আমার যখন কোন বিষয়েই হাত নেই, তখন আমার থাকা না থাকায় কি যায় আসে? মানুষের ব্যবস্থা চিরদিন যিনি করেন, তিনিই করবেন। মানুষের ওটা অনধিকার-চর্চা।

অন্তরে বিরক্তি পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতেছিল, বলিলাম, আপনি বলেন—সংসারে মায়া হ'ল স্বর্ণমৃগ। কিন্তু আপনি যার পেছনে ছুটেছেন, সেটা কি? সে যে মৃগতৃষ্ণিকা।

নিশানাথবাবু শুধু হাসিলেন।

আবার বলিলাম, বলতে পারেন, ঈশ্বর যদি থাকেন, তবে তিনি কত বড়? জানেন,

ঐ একটি সূর্য কত বড় ? কত তার দীপ্তি, কত তার তেজ ? এমনই কোটি কোটি সূর্য আবিষ্কৃত হয়েছে, আরও শত শত কোটি এখনও অনাবিষ্কৃত। যার তেজের কণামাত্র অংশে এমনই কোটি কোটি সূর্য, সৌরমণ্ডল সৃষ্টি হয়েছে, তার সম্মুখীন হবার কল্পনা করতে পারেন আপনি ? সে বিরাট শ্রেষ্ঠকে দেখবার দৃষ্টি আছে আপনার ?

এবার তিনি বলিলেন, সমুদ্র দেখেছ নরু ? কতটুকু অংশ তার দেখা যায় আমাদের দৃষ্টিতে ? যদি জাহাজে ক'রে সমগ্র সমুদ্রটাও দেখে থাক, তবুও কি তাকে সমগ্র অখণ্ডরূপে দেখা হয় ? হয় না, সেই খণ্ডই দেখা হয়। কিন্তু মনের মধ্যে তাকিয়ে দেখ, সেখানে ওই অসীম বিশাল সমুদ্র সম্পূর্ণ অখণ্ডরূপে ধরা দিয়েছে। মানুষের দৃষ্টি ক্ষুদ্র, কিন্তু মনকে ক্ষুদ্র ভেবো না। ঈশ্বর কি রূপ ধরে আসেন ? অরূপরতন মনের মধ্যে স্পর্শ দিয়ে যান, দেখা কি, বুকে জড়িয়ে ধরেন।

বহুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। তারপর বলিলাম, তা হ'লে আমি যাই।

পিছন হইতে তিনি আবার ডাকিলেন, একটা কথা শোন তো একবার।

বলুন।

আমাদের বাড়ির, মানে ছেলেগুলো—

ভালই আছে। বউদিদিও ভাল আছেন।

সে বোধ হয় খুব রাগরোষ করে আমার ওপর ?

উত্তর দিলাম, না না, তাই কি হিন্দুর মেয়েতে কখনও পারে ?

অদ্ভুত মানুষের মন, বউদিদির ও তাঁহার সন্তানদের দুঃখদুর্দশার কথা বলিয়া তাঁহাকে উদ্বিগ্ন করিতে প্রবৃত্ত হইল না।

চার

মাস কয়েক পর। গরমের ছুটির ঠিক পূর্বেই হীরু একখানা পত্র লিখিয়াছিল। সে কাশ্মীর যাইবে, আমাকেও তাহার সঙ্গে যাইতে হইবে ; চিঠি পাইবার পরদিনই পাঞ্জাব মেলে উঠিবার জন্য যেন প্রস্তুত হইয়া স্টেশনে উপস্থিত থাকি।

চিঠিখানা ছিঁড়িয়া ফেলিলাম, স্টেশনেও গেলাম না। ধনকে আমি শ্রদ্ধা করি, কিন্তু ধনের দম্ভকে আমি ঘৃণা করি, এবং ধনীর মধ্যে শতকরা নিরানব্বই জনই দাম্ভিক। তাহারা তো ধনকে আয়ত্ত করে না, ধনই তাহাদের জয় করে, ক্রয় করে। হীরুকে আমি ভালবাসি, কিন্তু হীরু তো ধনীর সন্তান। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সে যদি ধনের কাছে মাথা হেঁট করিয়া থাকে, তাহা হইলে সমস্ত জীবন সে আমার কাশ্মীর ভ্রমণের খরচের অঙ্কটা আমার কাছে অক্ষয় পাওনারূপে জমা করিয়া রাখিবে। কাশ্মীরের সৌন্দর্যের মধ্যে হীরুর মত সুন্দরকে হারাইব না।

মাসখানেক পরই কিন্তু হীরু নিজে আসিয়া আমার কাছে হাজির হইল। ঘরে বসিয়া লিখিতেছিলাম, মামাতো ভাই আসিয়া বলিল, দাদা, একজন ভদ্রলোক এসেছেন, তোমায় খুঁজছেন। উঃ, কি সুন্দর দেখতে তিনি, আর কত জিনিসপত্র তাঁর সঙ্গে !

বাহিরে আসিয়া দেখিলাম হীরু। কলিকাতা-প্রবাসী শৌখিন ধনীপুত্র হীরু। বেশভূষা

ও প্রথম যৌবনসমৃদ্ধ হীরুকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলাম।

হীরু বলিল, দাঁড়া, তোর এই বিস্ময়বিমুগ্ধ অবস্থার একটা ছবি তুলে নিই।

ক্যামেরা তাহার কাঁধে ঝোলানই ছিল। সত্য সত্যই সে আমার একটা ছবি তুলিয়াই লইল। তারপর হাসিয়া বলিল, এই একখানা ফিল্মই বাকি ছিল।

আমি হাসিয়া বলিলাম, কাশ্মীরের অপরূপ সৌন্দর্যের পটচ্ছবির শেষে আমার মত কৃষ্ণাঙ্গকে দিয়ে কি পূর্ণচ্ছেদ টানলি?

সে হো-হো করিয়া হাসিয়া গড়াইয়া পড়িল, তারপর বলিল, তোর অন্তর্দৃষ্টিকে প্রণাম করি। সত্য সত্যই এ হ'ল পূর্ণচ্ছেদ। এমন সুশোভন অর্থপূর্ণ পূর্ণচ্ছেদ আর হয় না নরু।

কেন?

সে বলব পরে।—বলিয়া ঘরে সমাগত আমার আত্মীয়স্বজনদের দিকে চাহিয়া দেখিল।

মামা ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, চা জলখাবার নিয়ে এস নরু। তাই বা কেন, তোমার বন্ধুকে বাড়ির মধ্যেই নিয়ে যাও।

বাড়ির মধ্যে মাকে প্রণাম করিয়া হীরু বলিল, আপনাকে দেখলেই নরুর ওপর আমার হিংসে হয়।

মা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, মা কি চিরদিন থাকে বাবা, তার জন্যে দুঃখ ক'রে বাড়ি ছাড়ে কে? তুমি শুনলাম বাড়ি পর্যন্ত ছেড়েছ; পুজোয় বাড়ি যাওনি!

হীরু হাসিয়া বলিল, মায়ের আঁচল থেকে মুক্তি পেয়ে ঘুরে বেড়াবার পথে পেয়ে বসেছে মা। বেড়িয়ে যেন আশ মিটছে না। দেখেছেন তো ছোট ছেলের হাঁটবার ক্ষমতা হ'লে তার ছুটে বেড়াবার সাধ, ধুলো মাখার বহর?

অপরাহ্ণে গঙ্গার ধারে বেড়াইতে গিয়া তাহাকে বলিলাম, তারপর কাশ্মীরের রূপ কেমন লাগল বল।

সে বলিল, কাশ্মীরের রূপের চেয়ে কাশ্মীর-রূপসীর রূপ আমার বেশি ভাল লেগেছে। তাদের চোখের স্বচ্ছ শোভার কাছে হ্রদের শোভা ম্লান হয়ে গেল, ননীর মত দেহবর্ণের লাবণ্য থেকে তুষার-শোভার দিকে চোখ ফেরাবার অবকাশ হ'ল না।

আমি সবিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। সে আবার বলিল, তখনকার পূর্ণচ্ছেদের কথাটায় তখন পূর্ণচ্ছেদ টানতে দ্বিধা হ'ল। তোর গুরুজন ছিলেন অনেক। আমার ক্যামেরাটার পটধারার প্রত্যেকটি হ'ল রূপসীর ছবি; সর্বশেষে ছবি হ'ল তোর। তাই তখন বললাম, এমন সুশোভন অর্থপূর্ণ পূর্ণচ্ছেদ আর হয় না।

আমিও এবার হাসিলাম, তারপর প্রশ্ন করিলাম, শুধু দেখেই এলি?

হীরু বলিল, না, প্রেমও হয়েছিল; হ্রদের বুকে হাউস বোটের মাঝি মেয়ে একটি, কিশোরী অপরূপ রূপসী, সে মুগ্ধদৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকত। একদিন সে ফুলও আমায় উপহার দিয়েছিল। সে ফুল নিয়ে খেলা করছিল, আমি তাকে বললাম, আমায় দাও না ফুলগুলো। সে চারিদিকে চেয়ে হেসে ফুলগুলো আমায় দিলে। আমি তাকে কিছু দিতে পারিনি, সাহস হয়নি। শুধু তারই ছবিতে পরিপূর্ণ ক'রে এনেছি ক্যামেরাটা।

সে পকেট হইতে একখানা খাম বাহির করিয়া ছোট ছোট ছবিগুলি আমায় দেখাইল। আমি মুগ্ধ হইয়া দেখিতেছিলাম। হীরু বলিল, ওর মুখের দিকে চেয়ে ভাবতাম কি জানিস? ভাবতাম, কেন আমি ভারতের সম্রাট নই, অন্তত কাশ্মীরের অধিপতিও নই! তা হ'লে আমার কাশ্মীর হ্রদের পদ্মপুষ্প আহরণের অধিকারে কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারত না। তার

মুখের দিকে চেয়ে কল্পনা করতাম, পূর্বজন্মে আমি ছিলাম সম্রাট আলমগীর, আর সে ছিল নীলনয়না কাশ্মীরী বেগম।

ছবিগুলি তাহাকে ফিরাইয়া দিয়া বলিলাম, একখানা ছবি আমায় দিবি ?

সে বলিল, না। ওর প্রত্যেক ভঙ্গির ছবিটি আমি রাখব।

হাসিয়া বলিলাম, কেন, মনে মনে রেখে দে।

মন কি এত সহজ ক্ষেত্র বন্ধু ? বনের চেয়েও সে জটিল। বনে আজ যে মহীরুহ বনস্পতি, দশ বছর পরে অপরের আবির্ভাবে সে হয় অকিঞ্চিৎকর, শুষ্ক হয়ে তার জীবনান্ত হওয়াও অসম্ভব নয়।

তা হ'লে সম্রাট আলমগীরকে আর দোষ কেন ? কাশ্মীরী বেগমের নীলনয়নের মোহ যদি সময়ক্ষেপে ঘৃণায়ই পরিণত হয়ে থাকে, তবে তাতে অপরাধ কি ?

না, দোষ আমি তাঁকে দিই না। শুধু তাঁকে কেন, যে শিব সতীর মৃতদেহ কাঁধে ক'রে উন্মত্ত হয়ে ফিরছিলেন, তাঁর গৌরীর প্রেমে আত্মবিক্রয়েও আমি তাঁকে দোষ দিই না।

আমি সবিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম, ধনীর দাম্ভিক দুলাল বলে কি !

সে বলিল, একে শুধু মোহই বল কেন ? চেকভের ডার্লিং-এর মধ্যে যে বস্তুটা ছিল, সেটা কি মোহ, না প্রেম-স্নেহ-মমতা ? ওই একই বস্তু বন্ধু, একই বস্তু ; শুধু প্রকারান্তর। শুধু নারী নয়, নারী পুরুষ সবার মধ্যেই আছে চেকভের ডার্লিং !

এবার আর স্থির থাকিতে পারিলাম না, বলিলাম, রাগ করিস নি হীরু, তোর উপর আমার ঘৃণা হচ্ছে। আলো এবং অন্ধকার চেনবার ক্ষমতা পর্যন্ত তুই হারিয়েছিস !

সে হাসিয়া বলিল, কিন্তু মিথ্যেই রাগ করছিস। কারণ গাঢ় অন্ধকার আর অত্যুজ্জ্বল আলো দুইয়েরই কার্যশক্তি এক। দুয়ের মধ্যেই দৃষ্টিশক্তি হয় নিষ্ক্রিয়। সুতরাং দুটো বস্তুর মধ্যে আসলে প্রভেদ কিছু নেই ! আসল প্রভেদ তোর ও আমার মধ্যে।

আর তাহার সহিত তর্ক করিলাম না। হীরু পরদিনই চলিয়া গেল।

কিছুদিন পর সংবাদ পাইলাম, হীরু বিলাত চলিয়াছে।

বৎসরখানেক পর তাহার নিকট হইতে পত্র পাইলাম। বেশ মোটা পত্রখানি, দীর্ঘ পত্র লিখিয়াছে বোধ হয়। চিঠিখানা খুলিয়া পাইলাম, ছোট একখানা চিঠি আর কতকগুলি ফোটো। ফোটোগুলির একখানা তুলিয়া দেখিলাম, সেই কাশ্মীরী সুন্দরীর ছবি। সবগুলিই তাহার ছবি। চিঠিখানা পড়িলাম—

"নরু, কাশ্মীর-রূপসীর একখানা ছবি তুই একদিন চেয়েছিলি। সেদিন দিতে পারি নি, আজ সবগুলো তোকে পাঠালাম। বন্ধু, মন-অরণ্য যে লতার জালে আচ্ছন্ন ছিল, সে লতা-জাল বিগতায়ু হয়েছে, শুকিয়ে ঝ'রে পড়েছে। শুষ্ক লতা বহ্নিমুখে সমর্পণ না ক'রে তোর কাছে পাঠালাম। লেখকের কাজে লাগতে পারে। অরণ্যে নতুন যে লতাজাল দেখা দিয়েছে, তার পরিচর্যায় আমি ব্যস্ত। বেশি লেখবার অবকাশ নেই। ইতি।"

হীরু যাহা করিতে পারে নাই, আমিই তাহা করিলাম। সমস্ত ছবিগুলি একে একে বহ্নিমুখে সমর্পণ করিলাম। তাহাকে লইয়া যে কাহিনী রচনা করিলাম, তাহার উপসংহারেও তাহাই লিখিলাম। লিখিলাম—"কাশ্মীরী মৃতদেহ চিতায় পুড়িতেছে ; তাহার প্রণয়ী শ্মশানে পর্যন্ত আসে নাই। আমি তাহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিতেছি। অপরূপ রূপ ছাই হইয়া আসিতেছে, আমি নির্নিমেষ নেত্রে তাহাই দেখিতেছি।"

কাশ্মীর-রূপসীর ভস্মাবশেষ কিন্তু আমার ললাটে জয়তিলক হইয়া ফুটিয়া উঠিল। গল্পটার

প্রশংসা হইল খুব।

ইহার পরই আমার দেশের সহিত সম্বন্ধ ঘুচিয়া গেল।

কার্যোপলক্ষ্যে মা দেশে গিয়াছিলেন, হঠাৎ দেশ হইতে টেলিগ্রাম পাইলাম—"মায়ের কলেরা হইয়াছে, শীঘ্র এস।"

সমস্ত শরীরটা ঝিম্‌ঝিম্‌ করিয়া উঠিল। চোখের সম্মুখে সমস্ত কিছু যেন থরথর করিয়া কাঁপিতেছিল। পৃথিবীর বৈচিত্র্য, উজ্জ্বল দিবালোক সমস্ত এক মুহূর্তে অর্থশূন্য বলিয়া মনে হইল। সেদিন সে মুহূর্তে মৃত্যু সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলে সানন্দে তাহাকে আলিঙ্গন করিতে পারিতাম।

কোন সন্তানের কাছেই নিজের মা অপরের মায়ের চেয়ে খাটো হয় না—স্নেহে তো নয়ই! আলেকজাণ্ডারের মা নগণ্যতম দীনদুঃখীর মায়ের চেয়ে অধিক স্নেহময়ী নন; এ কথার চেয়ে বড় সত্য কথা আর নাই। কিন্তু তবু বলিব, গুণে—যে গুণ থাকিলে নারী উপযুক্ততম জননী হইতে পারে, সে গুণে সে শক্তিতে মায়ের আমার তুলনা ছিল না। হয়তো একথা অপরে বলিবে মিথ্যা, অতিরঞ্জন; কিন্তু আমার কাছে এ সর্বোত্তম সত্য। পাগলের মত দেশে ছুটিয়া গেলাম।

গ্রামে প্রবেশ করিতে পা উঠিতেছে না। নিষ্ঠুরতম সংবাদ মনে বার বার অবাঞ্ছনীয় অবাধ্য কল্পনায় ফুটিয়া উঠিতেছিল, তবু মানুষের প্রত্যক্ষ কণ্ঠস্বরের মধ্য দিয়া সে সংবাদ পাছে শুনি—এই আশঙ্কায় বার বার কাঁপিয়া কাঁপিয়া সারা হইলাম।

গ্রামেই বা মানুষ কই? অপ্রশস্ত দীর্ঘ পল্লীপথ জনশূন্য, দুই পাশের গৃহদ্বার সমস্ত রুদ্ধ। শুধু দুই একটা পথচারী কুকুর আমাকে দেখিয়া কয়েকবার চীৎকার করিয়া পলাইয়া গেল। মনে হইল, গ্রামখানার সর্বাঙ্গে যেন একটা কালো ছায়া কে মাখাইয়া দিয়াছে।

বাড়ির দরজায় ঢুকিয়া ডাকিলাম, মা!

ঘরের বারান্দায় বাহির হইয়া আসিলেন, খুড়ীমা আর নিশানাথবাবুর স্ত্রী—বউদিদি।

সভয়ে প্রশ্ন করিলাম, আমার মা?

ম্লানমুখে খুড়ীমা বলিলেন, এস, এই ঘরে রয়েছেন।

ঘরে ঢুকিয়া মাকে দেখিয়া ভয়ে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। আমার সেই মা এমন হইয়া গিয়াছেন!

চীৎকার করিয়া ডাকিলাম, মা—মাগো!

ইশারা করিয়া মা কি যেন নিষেধ করিলেন। তারপর অতি ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন, আমায় নাড়াঘাঁটা ক'র না বাবা। রোগটা বড় ছোঁয়াচে।

চোখের জল আর বাঁধ মানিল না, অশ্রু-আবেগ-পীড়িত কণ্ঠে বলিলাম, তোমার সেবা করতে পাব না মা?

মা বলিলেন, তুমি স্থির হও, মনকে শক্ত কর; ছোঁয়াচ নিবারণ করবার উপায় যা পড়েছ, সেইমতো তৈরি হয়ে এস। সেবা করবে বইকি, তোমার সেবা নেবার জন্যেই বেঁচে আছি এখনও।

বহু কষ্টে কতবার থামিয়া থামিয়া কথাগুলি তিনি শেষ করিলেন ও চাহিলেন, জল!

স্বর তখন অনুনাসিক হইয়া আসিয়াছে।

সে রাত্রির স্মৃতি সমস্ত জীবনে অক্ষয় হইয়া থাকিবে। দুর্যোগময়ী অন্ধকার রাত্রিপথে কাটাইয়াছি, প্রকৃতির বিপ্লব মাথার উপর দিয়া গিয়াছে। কিন্তু এই রাত্রির উদ্বেগ, কষ্ট এবং

ভীষণতার সহিত কিছুরই তুলনা হয় না। মৃদু আলোকে আলোকিত কক্ষের মধ্যে মৃত্যুপথ-যাত্রিণী মায়ের শয্যাপার্শ্বে বসিয়া আমি আর খুড়ীমা।

সন্ধ্যাতেই বউদিদি বিদায় লইলেন, কত যেন অপরাধীর মত বলিলেন, আমার যে না গেলে নয় ঠাকুরপো, ছেলেগুলো আছে, জান তো তোমার দাদার কথা!

চোখ দুইটি তাঁহার ছলছল করিয়া উঠিল। আমি বলিলাম, না না, আপনি যান বউদি; এই যা করলেন তাই আমার চিরদিন মনে থাকবে।

বউদিদি বোধ হয় স্থান-কাল সব ভুলিয়া গেলেন, বলিলেন, দাঁড়াও না, মা ভাল হয়ে উঠুন, তারপর এর জবাব দোব। 'চিরদিন মনে রাখা' করাব।

মুহূর্তের অসাবধানতায় বোধ হয় তাঁহার আনন্দ-ভুখারী প্রকৃতিটি চঞ্চল হইয়া জাগিয়া উঠিয়াছিল। পরমুহূর্তেই নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া তিনি লজ্জিত হইয়া চলিয়া গেলেন।

মৃত্যু মায়ের শিয়রে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। বোধ করি সকলেরই শেষ-মুহূর্তে সে এমনই করিয়া দাঁড়ায় কিন্তু যেখানে জীবনের কোলাহল প্রবল, মৃত্যুপথযাত্রীকে ঘেরিয়া জীবনের জনতা যেখানে 'হায় হায়' করে, সেখানে এমনভাবে সে আপনার অস্তিত্ব প্রকট করিতে পারে না। এ যে সমস্ত ঘরখানা তাহার নিশ্বাসে, দেহগন্ধে ভয়াতুর হইয়া উঠিয়াছিল'।

স্তব্ধ প্রতীক্ষায় নীরবে বসিয়াছিলাম।

ও কেঁ, মাঁথার শিঁয়রে—মা বলিয়া উঠিলেন।

চমকাইয়া উঠিলাম, ভয়ে সমস্ত শরীরে রোমাঞ্চ দেখা দিল। বলিলাম, কে মা? কেউ তো নেই।

যন্ত্রণার মধ্যেও মা হাসিয়া বলিলেন, তুমি দেখতে পাবে না, আমি পাঁচ্ছি। তারপর আবার বহুকষ্টে বলিলেন, আমার কামনা ছিল নরু, আমি বড়লোঁক বিঁখ্যাত লোকের মা হব। তুমি চেষ্টা ক'র।

শেষরাত্রে মায়ের জীবন-দীপ নিবিয়া গেল।

দুই দিন পর গেলেন খুড়ীমা।

গ্রামে মহামারী প্রচণ্ড গ্রীষ্মের আগুনের মত জ্বলিতেছিল। প্রায় ঘরে ঘরে করুণ বিলাপের আর্তনাদ। দলে দলে লোক গ্রাম ছাড়িয়া পলাইয়াছে। শুনিলাম, প্রথমেই রাক্ষসী প্রবেশ করিয়াছিল হীরুদের সংসারে। সংসারটা একরূপ শেষ করিয়া ছাড়িয়াছে। হীরুর ছোট ভাই, তাহার খুড়ার সমস্ত সংসার—স্ত্রী পুত্র সব গিয়াছে। এত বড় বাড়িটার মধ্যে বাঁচিয়া আছে শুধু হীরুর বৃদ্ধ খুড়া, আর বিদেশে বংশের উত্তরাধিকারীরূপে হীরু।

আশ্চর্য মানুষের মন, আমার বিপদে সহানুভূতি দেখাইতে আসিয়া প্রসঙ্গক্রমে হীরুদের সংসারের এই বিপর্যয়কে লক্ষ্য করিয়া একজন বলিল, হীরুর ভাগ্যি বটে! সমস্ত সম্পত্তির মালিক হ'ল একা।

অন্য একজন বলিল, ও কি বলছ ভাই, এই তোমার রাজারামপুরের রায়-বাড়ির সম্পত্তি পেলে এক দূরসম্পর্কের জ্ঞাতি। আমি দেখেছি হে, শীতে ব্যাটার গায়ে কাপড় জুটত না। বুঝেছ, ওসব হ'ল পাতাচাপা কপাল, আমাদের মত কি আর পাথরচাপা!

একজন আসিয়া সংবাদ দিল, নিশি চাটুজ্জের কাণ্ড শুনেছ?

বিরক্ত হইয়া একজন বলিল, ও ভণ্ডটার কথা ছাড়ান দাও হে। সমস্তই লোকটার ভণ্ডামি, দেখ না কিছুদিন বাদে শিব-টিব একটা তুলে দেবাংশী হয়ে না বসে।

সংবাদ যে আনিয়াছিল, সে কিন্তু ছাড়িল না। বলিল, চাটুজ্জে রোজ পাঁচটা করে হোম ক'রবে আজ থেকে। পঞ্চতপা না কি বলছে।

মরবে তারই আয়োজন হচ্ছে আর কি! এই বৈশাখ মাস, আর এই কলেরার সময়; মরবে, ভণ্ডামি বেরুবে। আঃ তাই যদি পারতাম হে, তা হ'লেও যে কাজ হ'ত! যাকে বলে—পাথরে পাঁচ কিল, খাও না কত খাবে!

অদ্ভুত মানুষের মনের কলুষিত কাহিনী। নিশানাথবাবুকে নিবৃত্ত হইবার জন্য অনুরোধ করিতে প্রবল ইচ্ছা হইয়াছিল। কিন্তু সে ইচ্ছা মুছিয়া ফেলিলাম। আমার বিয়োগ-ব্যথাতুর উদাসীন চিত্র সংসারের উপরেই বিরূপ হইয়া উঠিল।

হীরুর কাকা আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। লজ্জিত হইয়াই গেলাম। সর্বহারা এই মানুষটির সংবাদ আমার পূর্বে লওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আমার ভবিষ্যৎ শেষ করিতে পারে নাই, কিন্তু হীরুর কাকার জীবনের ভবিষ্যৎ সে মুছিয়া দিয়াছে। পথে যাইতে যাইতেই মনে পড়িল, একটা গাছের কাহিনী। গাছটার শাখা-প্রশাখা সমস্ত কে কাটিয়া লইয়াছিল, দাঁড়াইয়া ছিল শুধু কাণ্ডটা। ছিন্নমুখ হইতে শুকাইয়া শুকাইয়া দীর্ঘ দিনে গাছটা মরিয়াছে। হীরুর কাকার ঠিক সেই অবস্থা।

হীরুর কাকা বলিলেন, তোমার মা খুড়ীমা দুজনেই গেলেন!

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলাম, হ্যাঁ। কিন্তু আপনার দুঃখের যে পার নেই, কি যে বলব খুঁজে পাই না।

ভদ্রলোক বলিলেন, সবই অদৃষ্ট, উপায় কি?

চোখ দুইটি তাঁহার সজল হইয়া উঠিল, ঠোঁট রুদ্ধ ক্রন্দনের আবেগে থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল। সান্ত্বনার বাক্য খুঁজিয়া পাইলাম না, নীরবে মাটির দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিলাম।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চোখ মুছিয়া তিনি বলিলেন, তার ওপর যন্ত্রণা দেখ, সব হারিয়েও বিষয়ের চুপড়ি মাথায় ক'রে বসে আছি। আজ একটা তামাদি, কাল একটা মামলার দিন, উপায় কি? করবেই বা কে?

বললাম, হীরুকে আসতে লিখলেন না কেন?

লিখেছি, কিন্তু আবার সাতপাঁচ ভাবছি। পড়াটা মাটি হবে; তা ছাড়া এই যুদ্ধের সময়, চারিদিকে জাহাজ ডুবছে।

তখন মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। এম্‌ডেনের আক্রমণে ভারতসাগর ভয়াবহ হইয়া উঠিয়াছে।

তারপরই তিনি বলিলেন, একটু কাজের জন্যেই তোমাকে ডেকেছি। সাগ্রহে বলিলাম, বলুন।

তুমি বোধ হয় জান, হ্যাঁ, তুমিও তো কয়েকবার টাকা দিয়ে গেছ। মানে—তোমার বাবা যে তমসুকে টাকা ধার করেছিলেন, সেইটের কথা বলছি। অবশ্য তামাদি নয়, তবে অনেক টাকা হয়ে গেল। দিন তো নায়েববাবু, নরেশ মুখুজ্জের হিসাবটা।

নায়েব আসিয়া হিসাবটা আমার সম্মুখে ফেলিয়া দিল, হিসাব প্রস্তুত হইয়াই ছিল। দেখিলাম, বাবা লইয়াছিলেন আট-শো টাকা, আজ পর্যন্ত বাবা ও বাবার মৃত্যুর পর মা দিয়াছেন বারো-শো-পঁচাত্তর টাকা; এখনও বাকি চোদ্দ-শোর অধিক।

বিস্ময় একটু হইয়াছিল, তাঁহার মুখের দিকে চাহিতেই তিনি সেটুকু অনুমান করিয়া

কহিলেন, সুদটা চক্রবৃদ্ধিহারে আছে কিনা, মানে—বৎসরান্তে সুদ আসলে গণ্য হয়।

আমি বলিলাম, বেশ, আমায় কিছু সময় দিন।

তা বেশ তো, সময় তুমি নাও না। তবে আমি বলছিলাম, আমাদের সঙ্গে ঐ যে চকরাঘবপুর মহলটায় তোমার অংশ রয়েছে ওইটে তুমি বেচে ফেল। তুমি হীরুর বন্ধু, আমি ওতেই দেনাটা শোধ ক'রে নোব। সামান্য মহল, তা হোক; জানব যে ওটা ষোল-আনা আমার হ'ল ঐ সুবিধেয় দামই দিলাম কিছু বেশি।

মুহূর্তে সমস্ত সংসারটা বিষাক্ত হইয়া উঠিল। বলিলাম, তাই হবে। কিন্তু আরও একটা কথা আমার রাখতে হবে। মায়েরও সংকল্প ছিল, আমারও তাই সংকল্প যে আমি পাটনায় গিয়ে বাস করি। তা হ'লে যদি আমার সমস্ত সম্পত্তি, মানে—জমি জমা, পুকুর-বাগানগুলোও আপনি নেন—

তা তোমার যদি সুবিধে হয়, তা হ'লে—তা বেশ, তাই নোব আমি। বাড়িটাও বেচবে নাকি?

না, ওটা থাক, যদি কখনও আসি, পৈতৃক ভিটে—থাক ওটা।

হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই ভাল। তা হ'লে সেই কথা রইল। তোমার মায়ের শ্রাদ্ধশান্তি হয়ে যাক, তার পর তাই হবে।

ফিরিবার পথে ভাবিলাম, সে গাছটা নাই, তাহার শিকড়গুলো তো এখনও মাটির নীচে আছে, সেগুলো বোধ হয় এখনও মাটির রস শোষণ করে। এইজন্যই নিশানাথবাবুর কাছে অনুরোধ করিতে যাই নাই।

বউদিদি আসিয়া বলিলেন, তুমি নাকি সব বেচে দিয়ে চ'লে যাচ্ছ ঠাকুরপো?

তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া পৃথিবীকে যেন আবার সুন্দর মনে হইল, বলিলাম, বাড়ি থাকছে, আসব বউদি মাঝে মাঝে। আপনাদের কি ছাড়তে পারি?

বউদিদির চোখ দিয়া তবুও ঝরঝর করিয়া জল ঝরিয়া পড়িল। আঁচল দিয়া চোখের জল মুছিয়া বলিলেন, তোমার মত আপনার জন আমার কেউ এ গাঁয়ে নেই ভাই। সেবার পূজোর কথা—

বাধা দিয়া বলিলাম, আপনার জনই যদি ভাবেন, তবে সে কথাটা ভুলেই যান।

হাসিয়া তিনি উত্তর দিলেন, ভোলা কি যায় ভাই? ওটা মনে গাঁথা হয়ে আছে ব'লেই তো তোমায় আপনার জন ভাবতে পারি।

কথাটা চাপা দিবার অভিপ্রায়েই বলিলাম, দাদা আবার পঞ্চতপা না কি করবার জন্য ক্ষেপে উঠেছেন শুনলাম।

এবার পুলকিত হাস্য বউদিদির অধরে খেলিয়া গেল, বলিলেন, না, সে বন্ধ করেছি।

সবিস্ময়ে বলিলাম, বলেন কি? মানা শুনলেন দাদা? শোনালেন কি ক'রে?

খিলখিল করিয়া হাসিয়া তিনি বলিলেন, আমাদের কি কম ভাব নাকি? তোমার দাদা আমার নতুন নাম দিয়েছেন কি জান? বলেন—মায়াবিনী।

প্রশ্ন করিলাম, কি মায়ায় দাদাকে ভোলালেন, শুনতে ইচ্ছে হয় যে!

মুখে কাপড় চাপা দিয়া বউদিদি উত্তর দিলেন, সে তোমার বউকে শিখিয়ে দোব। তোমায় ব'লে দিয়ে আমাদের গুমোর মাটি করব কেন?—বলিয়া বাহির হইয়া গেলেন। দরজার গোড়ায় দাঁড়াইয়া মুহূর্তের জন্য ফিরিয়া বলিলেন, তোমার দাদার তপোভঙ্গ হয়েছে।

পরমুহূর্তে তিনি বাহির হইয়া গেলেন।

কয়েক দিন পরেই সংবাদ পাইলাম, হীরু আসিতেছে। আমি দেশত্যাগ করিবার জন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিলাম, হীরু হয়ত আমার সংকল্পে বাধা দিবে। বন্ধুত্বের দাবি লইয়া আমাকে অনুগৃহীত করিয়া ছাড়িবে। কয়েক দিনের মধ্যে কাজ শেষ করিয়া ফেলিলাম।

চলিয়া আসিবার পূর্বদিন গেলাম বউদিদির ওখানে। দেখিলাম, নিশানাথবাবু ছোট ছেলেটাকে কোলে লইয়া গান গাঁহিয়া আদর করিতেছেন।

বউদিদি মুচকি হাসিয়া স্বামীর দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া দেখাইলেন, দেখ।

বউদিদির বিজয়ের কাহিনী লিখিবার সংকল্প লইয়া ফিরিয়া আসিলাম। নাম দিব স্থির করিলাম—'বিজয়িনী'।

ট্রেনে চাপিয়া চোখে জল আসিল।

এতকালের লীলাভূমি পিছনে পড়িয়া রহিল।

চন্দ্রনাথ হারাইয়া গিয়াছে, আজ হীরুকে হারাইলাম, সে ফিরিবে কিন্তু আমার সঙ্গে আর হয়তো দেখা হইবে না। নিশানাথবাবুকে লইয়া আমার ঔৎসুক্য নাই, নারী-কক্ষের শান্তি-কলসের বারিতে তিনি শান্ত হইয়াছেন।

আমার চিত্তাকাশের সমস্ত নক্ষত্রগুলি একে একে অস্ত গেল।

চিন্তাসূত্র ছিন্ন হইয়া গেল।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া একটা সিগারেট ধরাইয়া বসিলাম। অন্ধকারের মধ্যেও দেওয়ালের আয়নাটায় সিগারেটের আগুনের আরক্ত দীপ্তি ঝকমক করিয়া জ্বলিতেছে।

পাঁচ

পাইয়াছি।

দীর্ঘকালের পর আমার মনোগগন-প্রান্তে আবার কালপুরুষ নক্ষত্রের উদয় দেখিতেছি। চন্দ্রনাথের দেশত্যাগের বারো বৎসর পর, আমার দেশত্যাগের নয় বৎসর পর, সহসা একদিন চন্দ্রনাথের সংবাদ পাইলাম।

তখন আমি সত্য সত্যই লেখক হইয়াছি। দারিদ্র্যকে গ্রাহ্য করি নাই, প্রশংসার প্রলোভনও ধীরে ধীরে কমিয়া আসিয়াছে, 'আজি হতে লক্ষ বর্ষ পরে' এই স্বপ্ন লইয়া যাহা আরম্ভ করিয়াছিলাম, সে বস্তু আজ আমার সাধনার সামগ্রী। কিন্তু কেন যে এ সাধনা জানি না। মধ্যে মধ্যে সন্দেহ হয়, সত্যই কি সাধনা, অথবা কামনারই এ রূপান্তর বা নামান্তর? কতবার মনকে প্রশ্ন করিয়াছি, কি এর মূল্য? কোটি কোটি বৎসর পরে পৃথিবীরই তো একদিন জীবনান্ত হইবে, তখন কোথায় থাকিবে এসব? আবার তখনই ভাবি, হয়তো আমি পাগল হইয়া গিয়াছি। জীবনের জন্ত আয়োজনের যে প্রয়োজন আছে! জীবন তো তুচ্ছ নয়, মৃত্যুই যদি অমৃতলোক হয়, তবে জীবনই তো সে অমৃতলোকের সেতু।

কি ভাবিতেছি! আজ তো নিজের কথা ভাবিতে বসি নাই। তাহার অবসর অনেক পাইব। আজ যাহাদের কথা মনে করিয়া স্মৃতিতর্পণ করিতে বসিয়াছি, তাহারাই আজ এই অন্ধকার ঘরের ছায়াপটে কায়া গ্রহণ করিয়া আসুক।

তখন পাটনা হইতে কলিকাতায় আসিয়াছি। আমার পুস্তকপ্রকাশকের নিকট হইতে

একদিন একখানা পত্র পাইলাম। আমার হাতে পত্রখানা দিয়া তিনি বলিলেন, আপনার চিঠি, আমার ঠিকানায় এসেছে। কোন ভক্ত পাঠকের হবে।—বলিয়া তিনি হাসিলেন।

খামের চিঠি, ছিঁড়িয়া ফেলিয়া নামটা আগে দেখিয়া লইলাম; দেখিলাম, লেখক চন্দ্রনাথ! মুহূর্তে তাহাকে মনে পড়িয়া গেল,—সেই মোটা নাক, সেই দীপ্ত চক্ষু, কপালে কালো শিরায় রচিত সেই ত্রিশূলচিহ্ন, সে যেন সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল! এত দীর্ঘ দিনের অদর্শনে তাহার সমগ্র অবয়বের এক তিল স্থানও অস্পষ্ট হয় নাই। পত্রখানা পড়িলাম, চন্দ্রনাথের পুত্রের অন্নপ্রাশন, সে যাইতে লিখিয়াছে!—

"আত্মীয়বন্ধুর মধ্যে তোকেই প্রথম মনে পড়িয়া গেল, তাই নিমন্ত্রণ করিলাম। দাদাকেও নিমন্ত্রণ করি নাই, করিবার প্রয়োজনও নাই। তুই আসিলেই সুখী হইব। ইতি—চন্দ্রনাথ"

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িয়া গেল আর একজনকে, সুন্দর সুকোমল তনু হীরুকে। শুনিয়াছি, সে আবার বিলাতে গিয়াছে, ফিরে নাই। সেও কোথায় হারাইয়া গেল; বহুদিন তাহার সংবাদ পাই নাই। যাক, চন্দ্রনাথকে পাইয়াছি, সে-ই আজ আমার যথেষ্ট।

নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করিতে পারিলাম না, কানপুর রওনা হইলাম। পত্রের ঠিকানায় দেখিলাম, চন্দ্রনাথ কানপুরে থাকে। ঠিকানা অনুযায়ী গাড়োয়ান আনিয়া তুলিল শহরের বাহিরে গঙ্গার ধারে একখানা বাংলোর সম্মুখে। খানিকটা বাগান, বারান্দায় কয়খানা চেয়ার, ছোট একটা টেবিল, দেওয়ালে ঝুলানো একখানা আয়না, দরজার পাশেই একটা হ্যাট-র‍্যাক। আর কি আছে, বাহির হইতে দেখিতে পাইলাম না। তবুও বুঝিলাম, চন্দ্রনাথ সুখেই আছে। তাহার বউদিদির কথাটা মনে পড়িল, 'মণিমন্দির' না কি।

বাগানের ফটক খুলিতে গিয়া কিন্তু ধাঁধায় পড়িয়া গেলাম, একি, ফটকের গায়ে পিতলের ডোর-প্লেটে লেখা—সি. সিং! সিং কে? চন্দ্রনাথ তো চাটুজ্জে, বুঝিলাম ঠিকানা ভুল হইয়াছে। গাড়োয়ানকে বহুকষ্টে বুঝাইলাম, এখানে এক বাঙালী বাবু কোথায় থাকেন সন্ধান করিতে হইবে। সেই সময় বাংলোর ভিতর হইতে পর্দা ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসিলেন এক ভদ্রলোক। তাহাকেই অভিবাদন করিয়া ইংরেজীতে বলিলাম, দেখুন—

পরক্ষণেই শিখ ভদ্রলোক তাঁহার বিশাল বাহু প্রসারিত করিয়া বিপুল আগ্রহে বলিলেন, আরে নরেশ, তুই! নরু, সত্যিই তুই এসেছিস!

বিস্মিত হইয়া তখনও আমি তাহাকে দেখিতেছিলাম। দাড়ি-গোঁফে সমাচ্ছন্ন মুখের মধ্যেও সেই স্ফীত নাসা, সেই দৃপ্ত চক্ষু, প্রসারিত ললাটে সেই শিরায় রচিত ত্রিশূলচিহ্ন! সবই চিনিলাম, কিন্তু সে কিশোর চন্দ্রনাথের সঙ্গে কত প্রভেদ!

আমাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, চিনতে কষ্ট হচ্ছে? কিন্তু আমি যে শিখ হয়েছি। সঙ্গে সঙ্গে উপাধিটাও পাল্টে দিয়েছি। মীরা মীরা, বাইরে এস, কে এসেছে দেখ।

বাহির হইয়া আসিলেন একটি তরুণী, অপূর্ব রূপ, মুখ দেখিয়া পশ্চিমদেশীয়া বলিয়াই মনে হইল। বেশভূষাও শিখ মহিলার মতই, পরনে ঢিলা পাজামা, গায়ে চুড়িদার আস্তিন পাঞ্জাবি, মাথায় ওড়না। আমি যেন মোহগ্রস্ত হইয়া তাঁহাকে দেখিতেছিলাম। অপূর্ব রূপ, বর্ণে সুষমায় দেহের গঠন-ভঙ্গিতে সে যেন তিলোত্তমা! এই সময়েও ঘরের অন্ধকার আমার চোখের সম্মুখে নাই, বিদেশিনী রূপে সব যেন আলোকময় হইয়া উঠিয়াছে।

মহিলাটি হাত তুলিয়া নমস্কার করিয়া ভাঙা ভাঙা বাংলায় বলিলেন, নমস্-কা-র।

আমার চেতনা হইল। লজ্জিতভাবে প্রতি-নমস্কার করিয়া ত্রুটিটা সংশোধন করিয়া লইলাম। চন্দ্রনাথ পরিচয় করিয়া দিল, আমার স্ত্রী—মীরা। আর মীরা, ইনিই আমার

বন্ধু—নরু, নরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, লেখক নরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। অনেক খ্যাতি, বহুবার তো নাম শুনেছ, বই প'ড়ে গল্পও তোমাকে বলেছি। জানিস নরু, তোর বই পড়বার জন্তে মীরা বাংলা শিখতে চায়। তোর বই প'ড়ে আমি ওকে গল্প বলি, মীরার ভাল লাগে।

হাসিয়া আমি বলিলাম, আমার সৌভাগ্য। বাংলা শিখলে আরও অনেক ভাল জিনিসের সঙ্গে পরিচয় হবে আপনার, আমার চেয়ে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ লেখকের বই কত পাবেন।

মৃদু হাসিয়া মীরা উত্তর দিলেন, তাঁরা তো আমার দোস্ত্ নন।

উত্তর দিলাম, আমার বহুভাগ্য যে, আপনি আমার দোস্ত্। পৃথিবীর সব লোক যদি আমার দোস্ত্ হ'ত, তা হ'লে আমিই হতাম সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক।

মীরা বলিলেন, না না, সত্যিই আপনার লেখা শুনতে আমার বড় ভাল লাগে। আপনার দোস্ত্‌কে জিজ্ঞাসা করুন।

চন্দ্রনাথ যেন ইহারই মধ্যে অন্যমনস্ক হইয়া গিয়াছে। সে সম্মুখের রাস্তার দিকে চাহিয়া বলিল, তোর লেখা পড়ি, অতীত জীবনের সঙ্গে নতুন ক'রে পরিচয় হয়। কাগজে তোর সুখ্যাতি পড়ি, আনন্দ হয়, হিংসে হয়। কোথায় প'ড়ে থাকলাম—

চন্দ্রনাথের কথাটা শেষ হইল না, মুহূর্তের মধ্যে একটা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটিয়া গেল। বাংলোর ভিতর হইতে ছোট একটা পুতুলের মতো কুকুর নাচিতে নাচিতে আসিয়া চন্দ্রনাথের কোলের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। মুহূর্তে চন্দ্রনাথ যেন পাগল হইয়া গেল, বজ্রমুষ্টিতে সে কুকুরটার টুঁটি টিপিয়া ধরিয়া সজোরে দূরে নিক্ষেপ করিল।

ক্ষুদ্র নিরীহ জীবটা বার কয় পা চারিটা ছুঁড়িয়া উঠিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু উঠিতে পারিল না। তাহার একটা পা একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, মুখটায় আঘাত লাগিয়া রক্তাক্ত হইয়া উঠিয়াছে। আমি হতবাক হইয়া গিয়াছিলাম। চন্দ্রনাথের স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিলাম, দেখিলাম, তিনিও ভয়ে বিবর্ণ হইয়া গিয়াছেন ; চক্ষু সজল হইয়া উঠিয়াছে। চন্দ্রনাথের মুখের নিদারুণ কঠোরতা ধীরে ধীরে ম্লান হইয়া আসিতেছিল। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সে চাকরটাকে ডাকিয়া বলিল, জানোয়ারের হাসপাতালে দিয়ে আয় কুকুরটাকে।—বলিয়াই তাহার কি খেয়াল হইল, সে নিজেই কুকুরটাকে কোলে তুলিয়া লইয়া ধীরে ধীরে ফটক দিয়া বাহির হইয়া গেল। লক্ষ্য করিয়াছিলাম, কপালের শিরা-রচিত ত্রিশূল যেন উদ্যত হইয়া উঠিয়াছে।

মীরা অপরাধিনীর মত ম্লানমুখে ভাঙা ভাঙা বাংলায় আমাকে বলিলেন, বদন আর হাঁতে জল দিন, আমি চা তৈয়ারী করি।

আমি বলিলাম, চলুন আগে আপনার খোকাকে দেখে আসি।

মীরা আমাকে তাঁহার সন্তান দেখাইলেন। সুন্দর হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ শিশু, মায়ের বর্ণ-সুষমা ও চন্দ্রনাথের আকৃতির প্রশংসনীয় সমাবেশ। দোলনায় শুইয়া স্বাস্থ্যবান শিশু আপন মনে হাত দুইটি মুঠি বাঁধিয়া মুখে পুরিয়া লেহন করিতেছে, পা দুইটি শিশুদের অভ্যস্ত ভঙ্গিতে হাঁটুর কাছে ভাঁজিয়া জড় করিয়া রাখিয়াছে। আমি গাল টিপিয়া আদর করিয়া বলিলাম, বাঃ, বাঃ, সুন্দর খোকা! খোকন খোকন!

আদর পাইয়া শিশু পা দুইটি ছুঁড়িয়া দোলনাটিকে চঞ্চল করিয়া তুলিল।

মীরা বলিলেন, বলুন তো দোস্ত, ববুয়া আমার কেমন আদমি হবে? খোকন যখন বড় হবে তখন দুনিয়া ওকে ভালোবাসবে, না ভয় করবে?

আমি তাঁহার মুখের দিকে চাহিলাম, ক্ষণপূর্বের সজল চোখে জল তখনও ছলছল

করিতেছে। কিন্তু সে জলের নীচে প্রত্যাশার দীপশিখা জ্বলিতেছে। সজল নীল চক্ষুতারকা দুইটি প্রত্যাশার আনন্দে সত্যই দীপশিখার মতই উজ্জ্বল। তিনি সন্তানের মুখের দিকে চাহিয়া যেন সেই তথ্যের সন্ধান করিতেছিলেন। জ্যোতিষশাস্ত্রে কোন অধিকার ছিল না, শিশুর মুখ দেখিয়া ভবিষ্যৎ-চরিত্র নির্ধারণের শক্তি নাই, তবু বলিলাম, ভালোবাসবে, দুনিয়া ওকে ভালোবাসবে মীরা দেবী। প্রকৃতি ওর আপনার মত হবে ব'লে মনে হচ্ছে।

মীরা উজ্জ্বল হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, ওর নাম রাখব কি জানেন? নাম রাখব কুমারকিশোর সিং, শৌর্যে বীর্যে কার্তিকের মত বীর, আর তারই মত কিশোর, চিরদিন বালকের মত স্নেহ-ভিখারী।

মীরা নিজহাতে চা প্রস্তুত করিয়া দিলেন। চা পান করিতেছিলাম। চন্দ্রনাথ ফিরিয়া আসিল এবং আমারই পাশে একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিল। আমি মীরাকে বলিলাম, চন্দ্রনাথকে এক কাপ চা দিন। একসঙ্গে চা খাই আর গল্প করি।

মীরা স্বামীর দিকে চাহিল। চন্দ্রনাথ বলিল, ও, আজ বুঝি চা খাব না বলেছিলাম? তা দাও, নরু বলছে!

প্রশ্ন করিলাম, কেন?

হাসিয়া চন্দ্রনাথ বলিল, ও আমার খেয়াল।

বলিলাম, খেয়াল! অদ্ভুত খেয়াল তোর চিরদিনই কতকগুলো থাকবে? আর কতগুলি এমন খেয়াল আছে, শুনি?

সে উত্তর দিল, অনেক। যে কোন রকম নিয়মানুবর্তিতা, সে যার জন্যেই হোক, শরীর-ধারণের জন্যেই বল বা জীবনের উন্নতির জন্যেই বল, ও আমি মানি না।" যেদিন বেশি ক্ষিদে পায়, আমি সেদিন উপবাস করি; ও-ও এক ধারার দাসত্ব।

আমি হাসিয়া ফেলিলাম, বলিলাম, চিরদিনই অদ্ভুত থাকলি তুই!

চন্দ্রনাথ এ-কথার কোন উত্তর দিল না। সে যেন অকস্মাৎ কেমন অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছে। থাকিয়া থাকিয়া চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া সে ঘুরিয়া বেড়াইতে আরম্ভ করিল। মীরা চা প্রস্তুত করিয়া টেবিলের উপর নামাইয়া দিলেন।

আমি বলিলাম, চন্দ্রনাথ ব'স, চা তৈরি।

হুঁ।—বলিয়া আবার কটা পাক মারিয়া সে বসিল। দুই চুমুক চা খাইয়াই আবার সে উঠিয়া পড়িল, বলিল, বিশ্রী চা!

আমি কিন্তু পরম পরিতৃপ্তির সহিত চা খাইতেছিলাম, এমন সুন্দর চা আমি অনেক দিন খাই নাই।

বুঝিতে পারিলাম না, কিসে সহসা চন্দ্রনাথের সমস্ত বস্তু এমন বিস্বাদ করিয়া দিল। চন্দ্রনাথ কি আমাকে দেখিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই?

বেয়ারাটা আসিয়া বলিল, হুজুর মালী এসেছে। কি ফুল চাই?

অকারণে বিরক্তিতে ক্রোধে আগুন হইয়া চন্দ্রনাথ বলিল, না, ফুল চাই না।

আমি নিজেকেই যেন অপরাধী বোধ করিলাম।

কিছুক্ষণ পর তাহাকে খুশী করিবার জন্যই রহস্য করিয়া বলিলাম, কিন্তু তুই শিখ কেন হতে গেলি? ওইরকম একমুখ দাড়ি গোঁফ—নাঃ, ভাল লাগে না।

সে দাড়িতে হাত বুলাইয়া বলিল, কেন, বেশ তো, কেমন ভ্রমরকৃষ্ণ না কি বলিস তোরা?

বলিলাম, নাঃ, ভ্রমরকৃষ্ণই বলিস আর যাই বলিস ও আমার ভাল লাগছে না। মীরার মত সুন্দরীর পাশে—

সে হো-হো করিয়া হাসিয়া বলিল, বিউটি অ্যাণ্ড দি বীস্ট, অ্যাঁ?—বলিয়াই সে উঠিয়া দেওয়ালে আয়নায় আপনার মুখ দেখিতে দেখিতে বলিল, না, আজই এখুনি কামিয়ে ফেলব দাড়ি। ঠিক বলেছিস তুই।

সত্যই সে কামাইবার সরঞ্জাম লইয়া বসিয়া গেল।

কামাইতে কামাইতেই বলিল, শিখধর্মের মধ্যে একটা বিক্রম আছে বোধ হয় সেইজন্যেই ওই ধর্ম তখন নিয়েছিলাম। নইলে বিবাহ তো অন্য যে-কোন ধর্ম অনুসারে হতে পারত। দাড়িগোঁফহীন ধর্মের তো অভাব নেই।

ছয়

তারপর?

দ্বিপ্রহরের কথা ভাল মনে পড়ে না। অপরাহ্নের স্মৃতি সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতেছে।

গঙ্গার তীরভূমির উপর আমি ও চন্দ্রনাথ বসিয়াছিলাম। চন্দ্রনাথের বাংলোর পিছনেই গঙ্গা। বেয়ারাটা সেখানে চেয়ার পাতিয়া দিল। শীতের গঙ্গা, জলে মালিন্য নাই, প্রবাহে উচ্ছ্বাস নাই। ওপারের চরে ফসল পাকিয়াছে। সেই দিকে চাহিয়া রহিলাম।

চন্দ্রনাথ আবার যেন গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছে।

চন্দ্রনাথ একসময় বলিল, তোর খ্যাতি, তোর প্রতিষ্ঠা কতখানি নরু?

আমি সবিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে চাহিলাম।

সে আবার বলিল, বোধ হয় বাঙালীর মধ্যেই আবদ্ধ, নয়? অন্য জাতে তো—মানে অন্য ভাষাভাষীরা তো তোর নাম জানবে না!

বলিলাম, না, তবে বই তো অন্য ভাষাতে অনুবাদও হচ্ছে।

সে চুপ করিয়া রহিল।

প্রশ্ন করিলাম, কেন, এ কথা কেন?

চন্দ্রনাথ বলিল, আজ জীবনের অপব্যয়ের জন্যে আমার আক্ষেপ হচ্ছে নরু। তোর খ্যাতি, তোর প্রতিষ্ঠার জন্যে আমার হিংসে হচ্ছে। সকালে বোধ হয় এই জন্যেই আমি হিংস্র হয়ে উঠেছিলাম। ওই নিরীহ কুকুরটার ওপর পর্যন্ত নির্মম হয়ে উঠেছিলাম।

সে চুপ করিল। আমিও চুপ করিয়াই রহিলাম।

চন্দ্রনাথ আবার বলিল, অথচ এটুকু খ্যাতি, এটুকু প্রতিষ্ঠা আমার গ্রহণযোগ্যই নয়। আই. সি. এস. হবারও চান্স পেয়েছিলাম, কিন্তু নিই নি। দাসত্ব—সে যত বড়ই হোক সে দাসত্বই।

সে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল। অনর্থক কয়টা ঢেলা লইয়া গঙ্গার জলে ছুঁড়িয়া ছুঁড়িয়া মারিতে লাগিল। শেষে গোটা মাটির বুকেই আছড়াইয়া ফেলিয়া সে আবার বসিল।

আমি ওয়ারে গিয়েছিলাম, জানিস?

বিস্মিত হইয়া বলিলাম, কই, না! আর জানবই বা কি ক'রে বল? আজ বারো বছর

তুই দেশছাড়া, দেশের লোকে ভাবে—তুই হয়তো ম'রেই গেছিস। তোর দাদা—

বাধা দিয়া চন্দ্রনাথ বলিল, দাদার কথা থাক্।

আমি বলিলাম, জন্মভূমির সঙ্গেও তো কোন সম্বন্ধ রাখলি না।

সে বলিয়া উঠিল, জন্মভূমি আমার ওই গ্রামখানি নাকি? তা হ'লে তো যেটুকু মাটির ওপর প্রথম ভূমিষ্ঠ হয়েছিলাম, সেই মাটিটুকুই আমার জন্মভূমি হওয়া উচিত। ওই গ্রামটুকুর মধ্যে আমার জীবনের পরিধি ধরত কোথায়?

একটুখানি নীরব হইয়া থাকিয়া সে আবার বলিয়া উঠিল, পৃথিবীর বিপুলতা অনুমান করতে পারিস নরু—কত বিশাল, কত বিচিত্র?

মধ্যপথেই সে নীরব হইল। দেখিলাম, দৃষ্টি দূরে গঙ্গার বুকে নিবদ্ধ আর চেয়ারের হাতলটায় বার বার সে সজোরে মোচড় দিতেছে। সেটাকে যেন সে ভাঙিয়া ফেলিতে চায়।

সেদিনও মনে হইয়াছিল, আজও এই অন্ধকার ঘরের মধ্যে স্মৃতির তপস্যা করিতে করিতে শুধুই মনে হইতেছে, চন্দ্রনাথের কাছে যাওয়া আমার উচিত হয় নাই, ভাল করি নাই। ঘুমন্ত ক্ষুধাতুরকে জাগাইয়া দিয়া শুধু অশান্তিরই সৃষ্টি করা হয়। বেশ বুঝিলাম, চন্দ্রনাথের অন্তঃস্তলের ঈর্ষা ঘুরিয়া ঘুরিয়া বাঁকা পথে রূপান্তর গ্রহণ করিয়া বাহির হইয়া আসিতেছে।

প্রসঙ্গটা পরিবর্তন করিবার চেষ্টা করিলাম, বলিলাম, ওসব কথা আজ থাক্ চন্দ্রনাথ। আজ তোর কথা বল। যুদ্ধে গিয়েছিলি বলছিলি না?

সে বলিয়া উঠিল, মিলিটারী লাইফ অদ্ভুত। ঐ একটি লাইন, যার শৃঙ্খলা আমার দাসত্বের মধ্যেও বড় ভাল লেগেছিল। কিন্তু হত্যাকাণ্ড—সে চরম বর্বরতা! 'সেলফ' ব'লে কিছু নেই সেখানে—মানুষ নেই, মনুষ্যত্ব নেই; আছে শুধু শৃঙ্খলা, ডিসিপ্লিন। কিন্তু আশ্চর্য, তার মধ্যেও মনুষ্যত্ব মুহুর্মুহু আকাশস্পর্শী মিনারের মত রূপ গ্রহণ ক'রে আত্মপ্রকাশ করছে। প্রত্যেক সৈনিকটির মৃত্যু এমনই এক একটি টাওয়ার। গিয়ে আমার আক্ষেপ হয়েছিল অপচয় দেখে,—পৃথিবীর জনবল, শিল্প—উঃ, বড় বড় শিল্প, কত শিল্পীর সাধনার ধন, জ্ঞান, বিজ্ঞান—সমস্তের অপচয়।

আমি বাধা দিলাম, বলিলাম, না ওভাবে নয়, দেশ ছাড়ার পর থেকে তোর কাহিনী আমায় গুছিয়ে বল।

হাসিয়া চন্দ্রনাথ বলিল, লিখবি নাকি? আচ্ছা—

বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলাম মনের মধ্যে বিপুল একটা ক্ষোভ নিয়ে। হীরুর ওপর হিংসে প্রাণের মধ্যে ছিল, আর সেইটেই বোধ হয় সেদিন শক্তির কাজ করেছিল আমার মধ্যে।

আমি গঙ্গার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া শুনিতেছিলাম। সুদীর্ঘ প্রবাহিনী। বহুদূরে দিগ্বলয়রেখার কোলে আকাশে গঙ্গায় যেন মেশামেশি হইয়া গিয়াছে। সেখানে কতকগুলা পালতোলা নৌকা চলিতেছিল, মনে হইতেছিল, গঙ্গার বুক ঘেঁষিয়া যেন এক ঝাঁক বক উড়িয়া চলিয়াছে। ধীরে ধীরে সব যেন অর্থহীন হইয়া চন্দ্রনাথের কাহিনীর মধ্যে হারাইয়া যাইতেছে।

চন্দ্রনাথ বলিতেছিল—

রাত্রেও সেদিন বিশ্রাম করিনি। অন্ধকার রাত্রি, নির্জন পথ—দুধারে পাথুরে প্রান্তর। তারই মধ্য দিয়ে নক্ষত্রের আলোয় পথ হেঁটে চলেছিলাম আমি। বড় একটা কিছু করব—এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা আমার বুকের মধ্যে। তারপর বর্ধমান জেলায় এসে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড—

আমি যেন স্পষ্ট সমস্ত দেখিতে পাইতেছিলাম। পারিপার্শ্বিক হারাইয়া গেল, আমার

মনশ্চক্ষে দেখিতেছিলাম, বর্ধমান, মানভূম, হাজারিবাগের বিচিত্র পটভূমির উপর দিয়া কিশোর চন্দ্রনাথ চলিয়াছে। কাঁধে লাঠির প্রান্তে ঝোলানো বোঁচকা, শ্রমিকের মত বেশ। উর্বর শস্যক্ষেত্র, রক্তরাঙা অসমতল প্রান্তরের মধ্যে কলিয়ারির গিয়ার-হেড চিমনি, ধোঁয়া—তাহারই মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়াছে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড। তারপর হাজারিবাগের অরণ্যভূমি। দূরে দূরে আকাশের কোলে কোলে পাহাড়ের নীলাভ তরঙ্গ-বিন্যাস। সমস্ত পার হইয়া আমার কিশোর চন্দ্রনাথ আসিয়া উঠিল সিংভূমে।

চন্দ্রনাথ বলিল, টাটানগর যাব ব'লেই বেরিয়েছিলাম। টাটানগর থেকে দশ বারো মাইল দূরে একটা গ্রামে সেদিন সন্ধ্যা হয়ে গেল। রাত্রের মত গ্রামটায় আশ্রয় নিলাম। কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি, কিন্তু আকাশ আলো হয়ে উঠেছে—আকাশের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণটায় যেন আগুন লেগে গেছে। শুনলাম, টাটার কারখানায় ব্লাস্ট-ফারনেসের শিখার দীপ্তি। রাত্রে ভাল ঘুম হ'ল না। ভোর না হতেই বেরিয়ে পড়লাম। সুবর্ণরেখার তীরে এসে দাঁড়িয়ে একবার ওদিকে তাকালাম, মনে হ'ল বিরাট বিস্ময়! সারি সারি চিমনি, যন্ত্রের শব্দ, দিনের সূর্যালোকে ফারনেসের আগুনের আভা দেখা যায় না; দেখা যায় বকের পাখার মতো সাদা ধোঁয়ার কুণ্ডলী, আর অনুভব করা যায় তার উত্তাপ। যেদিন প্রথম কারখানায় ঢুকলাম, সেদিন মনে মনে প্রণাম করলাম মানুষকে—জেমসেদজীকে। তখন সবে লড়াইয়ের আরম্ভ। কারখানা হু হু করে বাড়তে আরম্ভ করেছে। উঃ, সে কি বিরাট, আর সে কি শব্দ! ইলেক্‌ট্রিক ক্রেনের শব্দে সমস্ত নার্ভ যেন শিউরে ওঠে। কাদার মত লোহার তালকে ইচ্ছামত গ'ড়ে তোলা হচ্ছে। গলিত লোহা গল গল ক'রে জলের মত ফায়ার-ক্লের পয়োনালী বেয়ে চলেছে। ঢুকে পড়লুম ডে-লেবারার হয়ে সেখানে। সে কাজ ক'রে গৌরব আছে নরু। ওই এতবড় বিপুল শক্তি, মানুষ তাকে ইচ্ছামত চালনা করছে। উঃ! স্টীল ফারনেসের ভিতর গলিত স্টীলের তাল, সে যেন সূর্যের একটি ভগ্নাংশ, ফারনেসের ঢাকনা খুলে দিয়ে তারই মধ্যে 'শভেল'-এ ক'রে কেমিক্যালস দিতাম আমি। অদ্ভুত, অদ্ভুত কাজ!

এই সময় একজন পাঞ্জাবী আসিয়া তাহাদের ভাষায় চন্দ্রনাথকে কি বলিল। চন্দ্রনাথ সেই ভাষায় তাহার সহিত কয়েকটা কথা বলিয়া তাহাকে বিদায় করিয়া দিল।

আমি প্রশ্ন করিলাম, কে?

ও আমার কারখানার মিস্ত্রী।

কারখানা!—জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চন্দ্রনাথের মুখের দিকে চাহিলাম।

চন্দ্রনাথ বলিল, এখানে আমার একটা মোটর মেরামতের কারখানা আছে। ওই আমার এখন জীবিকা। যাক, একটা অ্যাক্‌সিডেণ্টে আমার উন্নতির পথ সেখানে খুলে গেল। রোলিং-মেশিন হাউসে একটা কাজে আমি গিয়েছিলাম। রোলিং-মেশিন অবিরাম ঘুরছে, তারই বেগে আগুনের মত রাঙা স্টীলের বীম এগিয়ে চলেছে, মধ্যে মধ্যে মেশিনে পিটে কেটে ইচ্ছামত আকার ক'রে নিচ্ছে। সেইখানে মাথার ওপর ইলেক্‌ট্রিক ক্রেনে তুলে নিয়ে যাচ্ছিল আর একটা জ্বলন্ত লোহার বীম; হঠাৎ বীমটা ক্রেন থেকে খ'সে নীচে পড়ে গেল। সেখানে কাজ করছিল একটা পাঠান লেবারার, তারই ওপর পড়ল। সে একবার মাত্র চীৎকার করেছিল, কিন্তু মর্মান্তিক চীৎকার—জান বাঁচা-ও! একজন ছোকরা বাঙালী ভদ্রলোক, ওভারম্যান তিনি, সুইচের চার্জ নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন, পাগলের মত ছুটলেন ওই লোকটাকে বাঁচাতে। আমি কিন্তু তাঁকে বাঁচাতে পারতাম, যদি তাঁকেই ধরতাম; কিন্তু ওদিকে তখন সুইচ যদি বন্ধ না করি তবে রোলিং-মেশিনে ভয়ানক ক্ষতি হয়। নীচে রোলিং-মেশিনে হয়েছে কি,—একটা

বীম কেমন করে বেঁকে, দুটো রোলারের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। আমি ছুটে গেলাম সুইচের কাছে। আর এ ভদ্রলোক—নিতান্ত দুর্ভাগ্য তাঁর, একটা লোহার পাতে জুতো পিছলে তিনি এসে পড়লেন সেই জ্বলন্ত বীমটার ওপর। দুজনেই মারা গেল। আমি সুইচ অফ ক'রে দিয়ে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলাম। চমক ভাঙল সাহেবের পিঠ-চাপড়ানিতে। বললে, আশ্চর্য নার্ভ তোমার! চান্স পেয়ে গেলাম, কিছুদিনের মধ্যেই একটা পরীক্ষা দিয়ে ওভারম্যান হলাম।

আমি শিহরিয়া উঠিলাম। বলিলাম, লোকটাকে না বাঁচিয়ে যন্ত্রটাকে বাঁচাতে গেলি তুই?

চন্দ্রনাথ হাসিয়া বলিল, হ্যাঁ, ওই যন্ত্রটার কোন অংশ, কি যন্ত্রটাই যদি অচল হ'ত তবে কত ক্ষতি হ'ত সে তুই অনুমান করতে পারবি না। তুই শুধু ভাবছিস, ওই একটা যন্ত্র; কিন্তু আমার চোখে মনে হয়, ব্রহ্মলোকের একটা অংশ প্রত্যক্ষ সৃষ্টি হয় সেখানে।

আমি কিন্তু তখন চোখের উপর দেখিতেছিলাম, অর্ধদগ্ধ বাঙালীর ছেলেটিকে, যন্ত্রণায় সে যেন ছটফট করিতেছে। চন্দ্রনাথ চুপ করিল। আমি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সচেতন হইয়া বসিলাম। মনের মধ্যে দৃশ্যান্তর কাম্য হইয়া উঠিয়াছিল। ওপারের দিকে তাকাইলাম। সূর্য ঢলিয়া পাটে বসিতে আরম্ভ করিয়াছে। কয়খানা দেশী নৌকা ওপারের চর হইতে ফসল বোঝাই লইয়া এপারে আসিতেছিল। এপারে গঙ্গার তীরে দাঁড়াইয়া একজন মাঝি মাঝগাঙের একখানা নৌকাকে ডাকিতেছিল, আ—হো!

অপেক্ষাকৃত শান্ত হইয়া বলিলাম, তারপর?

চন্দ্রনাথ বলিল, আমাকে আটকাবার শক্তি কারও ছিল না। আমি ওপরে উঠতে আরম্ভ করলাম। কর্তৃপক্ষ আমাকে স্পেশ্যাল ট্রেনিং-এর জন্যে বিলেত বা আমেরিকা পাঠাবার সংকল্প করছিলেন। এমন সময় পড়ল বাঙালী পল্টন রিক্রুটের সাড়া। মনে হ'ল, দি প্লেস ফর মি, দি ওয়ার্ক ফর মি! ছেড়ে দিলাম চাকরি। রিক্রুটিং অফিসার আমার দেহ দেখে বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করেছিলেন, সত্যিই তুমি বাঙালী? খাঁটি বাংলায় জবাব দিলাম, হ্যাঁ সাহেব।

গঙ্গার ওপারে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া সে আবার আরম্ভ করিল, সেদিনের অনুভূতি, মনের কল্পনার পরিধি আজ স্বপ্ন ব'লে মনে হচ্ছে। সেদিন কল্পনা করেছিলাম কি জানিস, কি হবে এ কারখানায় পাঁচ-শো সাত-শো কি হাজার টাকা মাইনের চাকরি ক'রে? আর এ বিপুল একটা বাহিনীর শীর্ষে বসব আমি, সম্মুখে টেবিলের ওপর থাকবে ফিল্ডের ম্যাপ, আশেপাশে সারি সারি টেলিফোন। সংবাদ আসছে, আর ছোট ছোট আলপিনের পতাকাগুলি তুলে তুলে বসাচ্ছি। কবিতা কি সাহিত্যে আমার খুব প্রীতি ছিল না, সে তুই জানিস, কিন্তু সেদিন বার বার রবীন্দ্রনাথের কটা লাইন আমার মনে পড়ছিল, আজও মনে পড়ছে—

হায় সে কি সুখ, এ গহন ত্যজি
হাতে ল'য়ে জয়তুরী
জনতার মাঝে ছুটিয়া পড়িতে
রাজ্য ও রাজ্য ভাঙিয়া গড়িতে
অত্যাচারের বক্ষে পড়িয়া
হানিতে তীক্ষ্ণ ছুরি!

সে চুপ করিল।

এই সময় চন্দ্রনাথের স্মৃতির সহিত সম্বন্ধহীন একটি ঘটনা সেদিন ঘটিয়াছিল; সেটুকুও আজ মনে পড়িতেছে। কেমন করিয়া মালার সঙ্গে যেন বাড়তি একটি ফুল গাঁথিয়া উঠিয়াছে।

আকাশে সেদিন পাতলা স্তরের মেঘ ছিল। অস্তোন্মুখ সূর্যের শেষরশ্মি সে স্তরমেঘের উপর যেন আবীর ছড়াইয়া ছিল। মধ্য-আকাশ পর্যন্ত রঙিন। ওপারের ক্ষেতে রক্তসন্ধ্যার আভা, গঙ্গার বুকে যেন গলিত সোনার ঢল নামিয়াছে।

চন্দ্রনাথের বাংলোর পাশেই কানপুর ওয়াটার ওয়ার্কসের পাম্পিং স্টেশন। ছোট একটি বাঁধানো ঘাট, ঘাটের উপরেই বাগান, রাঙা গোলাপের সমারোহ শুধু তাহার উপর রক্তসন্ধ্যার আভায় রাঙা রঙ গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইয়া উঠিয়াছে। বেশ দেখিতেছি ঘাসে বসিয়া আছেন এক হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক, আর তাঁহার শিশুকন্যা—বছর চারেকের ফুটফুটে একটি মেয়ে। সহসা মেয়েটি ছুটিয়া গিয়া গঙ্গার ঘাটে নামিল, এক আঁচল জল তুলিয়া নিবিষ্ট চিত্তে দেখিয়া ফেলিয়া দিল। আবার এক আঁচল তুলিল, আবার ফেলিয়া দিল। আবার তুলিল।

ভদ্রলোক মেয়েকে ডাকিয়া বলিলেন, কি করছ তুমি?

হাতের অঞ্জলির জল দেখিতে দেখিতে মেয়েটি সকরুণ স্বরে বলিল, জলের সোনা কোথায় গেল বাবা?

জলের স্বর্ণবর্ণও ম্লান হইয়া আসিতেছিল, সূর্যের এককালি মাত্র তখন আকাশে ছিল।

সাত

এই সময়ে বোধ হয় মীরা আসিয়াছিলেন। হ্যাঁ, বেয়ারাটা আসিয়া টী-পয় পাতিয়া দিয়া চায়ের সরঞ্জাম লইয়া আসিল, তারপরই মীরা আসিলেন কতকগুলি খাবার লইয়া। আসিয়াই পুলকিত হাস্যমুখে চন্দ্রনাথকে ভাঙা ভাঙা বাংলায় বলিলেন, বল দেখি, আজ কি খাবার করেছি?

চন্দ্রনাথ বলিল, পাঞ্জাবী।

সকৌতুকে ঘাড় নাড়িয়া অস্বীকার করিয়া তিনি বলিলেন, না না না।

তবে, পেশোয়ারী, কি মাড়োয়ারী।

হ'ল না, হ'ল না। মীরা মৃদু মৃদু হাসিতেছিলেন।

তারপর আমাকে বলিলেন, নিন্দে করতে পাবেন না আপনি। আমি আজ বাংলা দেশের খাবার করেছি। তিনি টেবিলের উপর নামাইলেন কতকগুলি পিঠা চন্দ্রপুলি।

চন্দ্রনাথ সঙ্গে সঙ্গে একখানা চন্দ্রপুলি মুখে পুরিয়া বলিল, বাঃ!

আমি মুগ্ধ হইয়া মীরাকে দেখিতেছিলাম। এ বেলায় তাঁহার পরনে ছিল শাড়ি, হিন্দুস্থানী ধরনে পরা গাঢ় লাল রঙের শাড়ি, গায়েও তাঁহার লাল-রঙের ব্লাউজ, যেন অগ্নিশিখার মধ্যে অগ্নির প্রিয়তমা দীপ্তি সে। আর তাঁহার ঠিক সম্মুখে পশ্চিম দিগ্বলয়ে তখনও রক্তাভার রেশ। এ রূপ দেখিয়া মুগ্ধ না হইয়া উপায় ছিল না।

আমি অভ্যর্থনা করিয়া বলিলাম, বসুন।

মীরা হাসিয়া চন্দ্রনাথকে বলিলেন, বসব আমি?

চন্দ্রনাথ তাঁহার দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, বসবে? কিন্তু খাবারগুলো তো আজ নিজ হাতে তোমাকে করতে হবে। রাত্রে বেস্ট পাঞ্জাবী ডিশ খাওয়াতে হবে নরুকে।

মীরা বলিলেন, তবে আমি যাই।

তিনি পিছন ফিরিতেই আমার চমক ভাঙিল। আমি বলিলাম, না না না, আপনি বসুন, আপনি বসুন। আপনি নিজে হাতে রান্না করবেন সে হবে না। তার চেয়ে আপনি এখানে বসুন, তাতে ঢের বেশি আনন্দ হবে আমার।

মীরা স্বামীর দিকে চাহিয়া রহিলেন।

চন্দ্রনাথ কিন্তু খুশি হইল বলিয়া মনে হইল না। সে বলিল, আমার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলে কেন মীরা? বসতে বললে তোমাকে, তুমি ব'স।

মীরা বসিলেন। আমি বলিলাম, আপনাদের এই কাপড় পরবার ধরনটি আমার বড় ভাল লাগে। আর আপনাদের কাপড়ের রঙের বাহার! বর্ণ-বৈচিত্র্যের ওপর আপনাদের একটা স্বাভাবিক প্রীতি আছে, চমৎকার আপনার শাড়ির রঙটি! লাল অনেক দেখেছি কিন্তু এমন গাঢ় লাল—আপনাকে দেখাচ্ছে বড় সুন্দর!

চন্দ্রনাথ বলিল, ফতেপুরসিক্রির মেলাতে কি এই কাপড়খানাই তুমি পরনি মীরা?

মীরার মুখ আনন্দোজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, হ্যাঁ। মনে আছে তোমার আজও?

চন্দ্রনাথ বলিল, ও পোশাক তুমি পাল্টে এস। ও পোশাক প'রে তুমি আমি ছাড়া আর কারও সামনে এসো না।

মীরা অপরাধিনীর মত নত মুখে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, চন্দ্রনাথও উঠিয়া পড়িল।

আমি বিস্মিত হইয়া ভাবিতেছিলাম, চন্দ্রনাথ এত দুর্বল! অনাবৃত বাল্যজীবনের মধ্যে কোথায় কোনখানে লুকাইয়া ছিল তাহার দুর্বলতা! গঙ্গার দিকে মুখ ফিরাইয়া থাকিয়াও ক্রমশঃ দূরতর হইয়া বিলীয়মান লঘু পদধ্বনি শুনিয়া বুঝিলাম, মীরা চলিয়া গেলেন। তাঁহার পিছনে পিছনে বলিষ্ঠ পায়ের ভারী জুতার শব্দে মুখ ফিরাইয়া দেখিলাম, চন্দ্রনাথ মীরার অনুসরণ করিতেছে। শঙ্কিত হইয়া উঠিলাম, মীরার উপর দুর্ব্যবহার করিবে না তো? পর্দার অন্তরালে আলোকিত কক্ষ-মধ্যে মীরা অদৃশ্য হইয়া গেলেন। পর্দার বুকে তাঁহার ছায়া আমি দেখিতেছিলাম, কিন্তু ছায়ার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্থির গতিহীন। চন্দ্রনাথও পর্দা ঠেলিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার সবল ভ্রূক্ষেপহীন গতিবেগে এবার পর্দাটা একদিকে সরিয়া গিয়া জড় হইয়া গেল। আমার চোখের সম্মুখে আলোকিত কক্ষটার একাংশ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। চন্দ্রনাথ দুর্ব্যবহার কিছু করিল না, মীরাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইল। মীরার মুখের উপর তাহার মুখ নামিয়া আসিতেছিল। আমি উদ্বেগ অপসরণের আনন্দে সুস্থ হইয়া গঙ্গার বক্ষস্পর্শী অন্ধকারের দিকে মুখ ফিরাইলাম। দিগ্বলয় হইতে অন্ধকার আমার দিকে আগাইয়া আসিতেছে।

চন্দ্রনাথ ফিরিয়া আসিয়া আমার পাশে বসিয়া বলিল, মানুষের মনের সিংহদ্বারের পাশে অসংখ্য ভিক্ষুকের বাস। এক একটি আকাঙ্ক্ষা—যশের আকাঙ্ক্ষা, মানের আকাঙ্ক্ষা, ধনের আকাঙ্ক্ষা—আকাঙ্ক্ষার শেষ নেই মানুষের। এরা যেন এক একটি ভিক্ষুক। না, ভুল বলছি, প্রত্যেকে তারা আলেকজাণ্ডার, তৈমুর, নাদিরশাহের মত এক-এক অভিযানের নেতা। এক-এক জন এক-এক সময় এসে মনের সিংহাসন দখল ক'রে বসছে। যেদিন বাঙালী-পল্টনে নাম লেখালাম, সেদিন পর্যন্ত আমার মনের সিংহাসন দখল ক'রে বসে ছিল বিপুল প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা।

আমি হাসিয়া বলিলাম, ছেলেবেলার ধারণায় আমি মনে করতাম তুই খুব প্র্যাক্‌টিকাল, কিন্তু আসলে দেখছি, তুই খুব সেন্টিমেণ্টাল।

চন্দ্রনাথ বলিল, পাথরের ওপরে ফুলের গাছ হয় না, লোকে বলে তাকে মৃতমৃত্তিকা; কিন্তু পাথরে সবুজ শেওলার স্তর দেখা যায়। কোন্ মানুষ সংসারে আছে, যে সেণ্টিমেণ্টাল নয় নরু? চোখের জল যে শরীরযন্ত্রের একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার ক'রে ব'সে আছে। যতই মন শক্ত পাথরে পরিণত কর, চোখের জলের পয়োনালীতে বাঁধ দাও, সে শেষে ওই পাথর-মনকে আবৃত ক'রে সবুজ শেওলার মত আত্মপ্রকাশ করবে। যাক্ গে শোন। ফিল্ডে গিয়ে আবার আঘাত পেলাম। সেখানে দেখলাম, ওপরে ওঠবার পথ নেই। কালো রঙের আমাদের স্থান চিরদিন নীচে, বরফের মত আমাদের মাথায় চেপে থাকবার কায়েমী আসন সাদা জাতের। তবু আশা করলাম যুদ্ধশেষে একটা বড় চান্স পাব। কিন্তু আশ্চর্য, মন যেন ধীরে ধীরে বৈরাগী হয়েই উঠতে লাগল। ও মরণের মহা-মেলার মধ্যে দাঁড়িয়ে মধ্যে মধ্যে যেন শিউরে শিউরে উঠতাম। মৃত্যুভয়ে নয়, সৃষ্টির অপচয় দেখে। নিজের জীবনের নশ্বরতার জন্যে একদিন একতিলও আক্ষেপ হয়নি আমার। কিন্তু মানুষের ক্ষুদ্রতা দেখে, তার পৈশাচিকতা দেখে দুঃখের ক্ষোভের আর সীমা থাকত না। স্বার্থপর মানুষ স্বার্থের বর্বরতায় সৃষ্টির যে ক্ষতি করলে, কতকাল যাবে সৃষ্টির বিধাতার সে ক্ষতি পূরণ করতে!

অবসর-সময়ে মেসোপটেমিয়ার খর্জুর কুঞ্জের তলে বসে বসে তাই ভাবতাম। মনে হ'ত, এমন বাণী, এমন মন্ত্র সংসারে প্রচার করব, যার ঝঙ্কারে মানুষ ক্ষুদ্র যা-কিছু সব ভুলে যাবে। যুদ্ধশেষের ঠিক আগেই একদিন একটা ঘটনা ঘটে গেল, যাতে মনে আর দ্বিধা থাকল না, সংকল্প দৃঢ় ক'রে ফেললাম। মনের মধ্যে যশ ও প্রতিষ্ঠার যে আকাঙ্ক্ষা সম্রাট হয়ে বসে ছিল, তার সিংহাসন টলে গেল। সেই সিংহাসনে এসে বসল এক বাউল। অবাক হয়ে আজও ভাবি, সে কোথায় ছিল আমার মনের মধ্যে! একটা টার্ক প্রিজ্‌নার, তার প্রকৃতি ছিল অত্যন্ত শান্ত; সেইজন্য তাকে আমাদের লেবারারদের সঙ্গে কাজ করতে দেওয়া হয়েছিল; কিন্তু একদিন, কে জানে কেন, হঠাৎ একটা ছোট কথায় ক্ষেপে উঠে মারতে গেল আমাদের লেবার-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে। সঙ্গে সঙ্গে তার শাস্তি হয়ে গেল কি জানিস? তার হাত পা বেঁধে তাকে রেললাইনের ওপর শুইয়ে তার পায়ের ওপর দিয়ে ইঞ্জিন চালিয়ে দেওয়া হ'ল। অবশ্য কর্তৃপক্ষের অগোচরে এটা হ'ল, কিন্তু আমার মন বিদ্রোহ ক'রে উঠলো। দৃঢ় সংকল্প করলাম, সন্ন্যাস গ্রহণ করব আমি। পৃথিবীর জন্যে শান্তির বাণী বহন করে আনব—অমৃত-লোক থেকে। যুদ্ধশেষে আমার সার্ভিসের জন্যে আমাকে ইংলণ্ডে যে কোন ট্রেনিঙের জন্যে পাঠাতে চাইলে। ইচ্ছে করলে তখন আমি আই, সি, এস,-ও হতে পারতাম কিন্তু সে সমস্ত আমি প্রত্যাখ্যান করলাম। আমার অফিসার আশ্চর্য হয়ে বললেন, ইয়ংম্যান, এ তুমি করছ কি?

আমি বললাম, কি করছি সাহেব?

সাহেব বললেন, এ চান্স তুমি ছেড়ে দিচ্ছ?

বললাম, হ্যাঁ সাহেব।

বাউল বৈরাগীর প্রজা তখন আমি—বেরিয়ে পড়লাম, সম্বল এক লাঠি। এই লাঠি নিয়েই দেশ থেকে বেরিয়েছিলাম, আর খান-দুয়েক কম্বল আর লোটা—ব্যস।

•

বাউল চন্দ্রনাথের মূর্তি আমি কল্পনা করতে পারি না। সেদিনও পারি নাই, আজও পারিতেছি না। বার বার মনে হইতেছে, চন্দ্রনাথও তাহার এ জীবনের প্রতিবিম্ব কোন দিন নিজের চোখে দেখে নাই। আমি কল্পনার চোখে দেখিতেছি, বিপুল প্রতিষ্ঠালিপ্সু যুবা,

সম্বলহীন, পরিধানে ছিন্ন বস্ত্র, উল্কার মত ছুটিয়া বেড়াইতেছে পৃথিবীর মাথার উপরে বসিবে, সে বুদ্ধ নয়, খ্রীষ্ট নয়, ধর্মগুরু—রোমের পোপ হইতে চায় সে। তাহার ক্ষুধিত বৈরাগ্য প্রাপ্তির জন্য উন্মাদ!

চন্দ্রনাথ বলিল, সত্যই নরু, দেশে এসে দিন কতক বাউল হয়ে ঘুরলাম। গোটা ভারতবর্ষ ঘুরলাম, একবার নয়—দুবার। সমুদ্রের তীরে, বনে হিমালয়ের ওপরে, মন্দিরে, মসজিদে, কবরে; কত জায়গায় ঘুরলাম, কিন্তু যা চাই আমি, তা পেলাম না।

সে চুপ করিল। তাহার মনশ্চক্ষে কি যেন ভাসিয়া উঠিয়াছে। তাহার পরিতৃপ্ত মুখচ্ছবি, ধ্যানমগ্নের মত চোখের দৃষ্টি দেখিয়া তাহাই মনে হইল। চন্দ্রনাথ বলিল, এই সময় একদিন এক বাঙালী বুড়ীর কথা আমার প্রায়ই মনে হয়—বদরীনাথের পথে দেখা। যাত্রীরা সব ফিরছে তখন। আমায় দেখে আমার মুখে বাংলা কথা শুনে বুড়ী কেঁদে আকুল। বলে, তুই যে বাবা নদের নিমাই, কোন্ হতভাগীকে কাঁদিয়ে পালিয়ে এসেছিস, বল! কোথায় তোর বাড়ি বল!

আমি প্রাণপণে বোঝাবার চেষ্টা করলাম, কেউ নেই আমার। সে কিছুতেই বুঝবে না। আমার সঙ্গে থাকতে গিয়ে তার সঙ্গীরা এগিয়ে চলে গেল। বুড়ী কিছুতেই ছাড়বে না আমাকে। বলে, কেউ যদি নেই তোর, আমার সঙ্গে চল তুই। দেশে আমার ছেলের দু-হাজার টাকা আয়ের জমিদারি, তোকে বাড়িঘর ক'রে দেবে, বিয়ে দিয়ে দেবে। সে এক মহাবিপদ! অবশেষে বুড়ীকে ঠকিয়ে চ'লে আসতে হ'ল। কিন্তু আসবার সময় কেঁদেছিলাম আমি।

আমিও দীর্ঘনিশ্বাস না ফেলিয়া পারিলাম না। পকেট হইতে সিগারেট বাহির করিয়া ধরাইবার জন্য দেশলাই জ্বালিয়া দেখি চন্দ্রনাথের চোখে আজও জল দেখা দিয়াছে। বলিলাম, সত্যিই যে চোখে জল এল!

হাসিয়া যেন লজ্জিত হইয়াই চোখ মুছিয়া সে বলিল, বাঙালী মেয়ের মত মা হ'তে কোন জাত পারবে না। মা যশোদা গোপালকে গোষ্ঠে পাঠাইবেন, তাই কত চিন্তা—কত কান্না। অনেকে হাসে, বলে লুডিক্রাস, কিন্তু আমার বড ভাল লাগে। বুড়ীর কথা চিরদিন আমার মনে থাকবে।

একটুক্ষণ পরে সে আবার বলিল, এক-এক সময় ভাবি, বুড়ীকে না ঠকিয়ে যদি তার সঙ্গেই যেতাম, তবে থাকতাম হয়তো ভালোই। বুড়ীকে মা পেতাম, বেশ একটি গোলগাল শ্যামবর্ণা মেয়ে বিয়ে করতাম, তার মুখঝামটা খেতাম, আর দাওয়ায় বসে তামাক টানতাম। অত্যন্ত পরিশ্রান্ত মুহূর্তে সে কথা আমার প্রায় মনে হয়।

আমার মনে পড়িয়া গেল বউদিদিকে।

পরমুহূর্তে হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, দুর দুর, এক-এক সময়ে মানুষ ইডিয়ট হয়ে ওঠে। যাকগে, তারপর শোন—

শেষে সংকল্প করলাম, আর একবার যাব হিমালয়ে—আমার পাওনা আমাকে পেতে হবে। রওনা হলাম। ঘুরতে ঘুরতেই চলেছিলাম। হঠাৎ একদিন ঘোরার ওপরেও বিরক্তি ধরে গেল। ঠিক করলাম, সটান গিয়ে উঠব হিমালয়ে। পথে ফতেপুর সিক্রিতে গিয়ে দেখি, লোকের ভিড় জমেছে, ও-সময় সেখানে মেলা। ভাবলাম, মেলাটা দেখে আগ্রায় গিয়ে ট্রেন ধরব। মেলার মধ্যে গিয়ে কিন্তু মেলাটা না দেখে যেতে পারলাম না। সে মেলা তুই দেখিস

নক্ষ। বড় বড় এক্‌জিবিশন, শোনপুরের মেলাও দেখেছি, কিন্তু এ অপরূপ, অতি সুন্দর।

সে মেলা আমিও দেখিয়াছি ; সত্যই সে মেলা অপরূপ, অতি সুন্দর ; আজও স্মরণ করিলে চোখে দেখিতে পাই। সেদিনও চন্দ্রনাথ বলিতেছিল, আমি তন্ময় হইয়া দেখিতেছিলাম, কানপুরের গঙ্গাগর্ভের অন্ধকারের মধ্যে সে মেলার দৃশ্য যখন ভাসিয়া আসিল। অপরূপ দৃশ্য—কবরের চারিপাশে জীবনের কোলাহল, সেলিম চিস্তির স্মৃতিকে ঘেরিয়া যেন নওরোজের মেলা। রঙ রঙ আর রঙ, চারিদিকে যেন রঙেরই খেলা। বিচিত্র বর্ণের—ফিকা লাল, গাঢ় লাল, গোলাপী সবুজ, গাঢ় সবুজ, বাসন্তী, চাঁপা, হলুদ, রামধনুর মত সপ্তবর্ণে অনুরঞ্জিত শাড়ি ও কাঁচুলি পরিয়া সুন্দরীরই মেলা। দলে দলে তাহারা চলিয়াছে। সঙ্গে পুরুষ আছে, মেলাতেও পুরুষ আছে ; কিন্তু তাহারা যেন ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে, চোখে পড়ে না। সূর্যকরবিম্বিত পুঞ্জ পুঞ্জ ফেনায় আবরিত সাগরের ঢেউয়ের মত রঙিন-শাড়ি-পরা মেয়েরা যেন ফেনা, পুরুষেরা জল। ফেনার বর্ণচ্ছটাই আগে চোখে পড়ে। মেয়েরা আছেন দলের আগে। কয়টি ভিখারিণী মেয়ে দেখিয়াছিলাম, তাহাদের অঙ্গেও বিবর্ণ জীর্ণ রঙীন কাপড়। গাছতলায়, পান্থশালায়, বড় বড় পুরাতন পরিত্যক্ত প্রাসাদসমূহের বারান্দায় আপন আপন স্থান করিয়া লইয়া তাহারা যেন ওই গঙ্গাবক্ষের অন্ধকারের মধ্যে স্পষ্ট আমার চোখের সম্মুখে বসিয়া আছে। পথ বাহিয়া আবার কত দল চলিয়াছে, ঠিক ওই ঢেউয়ের মতই, খানিকটা আসে আবার দাঁড়ায়, ততক্ষণে পিছনের দল তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া যায়, আবার ইহারা চলে। গঙ্গায় জলতরঙ্গ-ধ্বনির মধ্যে নূপুর বাজিতেছে, বাঈজীর দলে যেন গানবাজনা চলিতেছে।

চন্দ্রনাথের বাড়ির পাশেই কোন গৃহস্থ বাড়িতে মেয়েদের বাদানুবাদ চলিতেছিল, আমার মনে হইল, সেই মেলায় কোন গৃহস্থের দলে যেন কি রান্না হইবে তাই লইয়া তর্ক চলিয়াছে। বাদানুবাদ থামিয়া হাস্যধ্বনিতে মুখরিত হইয়া উঠিল। বোধ হইল, রান্না লইয়া মতভেদ মিটিয়া গিয়াছে।

চন্দ্রনাথ বলিতেছিল, বাজারে বাজারে মেয়েরাই দর করছেন। হরেক রকমের জিনিস, রঙিন কাঠের খেলনা, পিতলের মূর্তি, কাঁসার সামগ্রী, জয়পুরী, মীনা-করা শখের জিনিস, শ্বেতপাথরের পুতুল ও বাসন, সুর্মা, জর্দা, আতর, রঙিন কাপড়, ফুলের গাছ, ফলের গাছ, পাখা, চামর, গালার চুড়ি, সত্যিই সে যেন নওরোজের বাজার, রূপের হাট। আমি যেন দিশেহারা হয়ে যাচ্ছিলাম, আমার মনের বাউলের গৈরিক উত্তরীয়তে যেন মুহুর্মুহুঃ চারিদিক থেকে টান পড়ছিল। মনকে কঠিনভাবে বাঁধলাম।

আমি হাসিয়া বলিলাম, বৈরাগীকে ওই রূপের হাটে সমাধি দিয়ে দিলেই হ'ত। তারও হ'ত অক্ষয় স্বর্গবাস, তোর জীবনেও কাব্য মূর্ত হয়ে উঠত।

চন্দ্রনাথ হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, উচ্চ হাসি চন্দ্রনাথের পক্ষে অস্বাভাবিক। তাহার পুলকিত উচ্চ হাসিতে আমিও পুলকিত হইয়া উঠিলাম, বুঝিলাম, তাহার মনের গ্লানি মুছিয়া গিয়াছে।

চন্দ্রনাথ বলিল, বিশ্বামিত্রের তপোভঙ্গ, কি বলিস! শোন তারপর। একখানা এক্কা ভাড়া ক'রে মেলাটা ঘুরে আগ্রা গিয়ে ট্রেন ধ'রে যোশীমঠের দিকে রওনা হব সংকল্প ছিল। মেলাটা অর্ধেকটা ঘুরেই এক্কাওয়ালাকে বললাম, আর না, মেলা থেকে বেরিয়ে পড়। তার মেলাটা ঘোরবার ইচ্ছা ছিল; সে বললে, আমীর, ওপাশটা দেখবেন না? ওদিকে সব 'বড়ঘরনা' জেনানা লোক রান্নাবান্না ক'রে খাচ্ছে। তাকে ধমক দিয়ে বললাম, ও পাজী, চল

চল, জল্‌দি চল। মেলার শেষ দোকানটায় জর্দা-সুরতি বিক্রী হচ্ছিল, খানিকটা নস্যির জন্যে দোকানটায় ঢুকলাম, নস্যি কিনে নিয়ে রওনা হলাম। জনকোলাহল পেছনে পড়ে রইল। এক্কাটা ঝুনঝুন ক'রে চলছিল। বেশ মনে আছে নরু, মনের বাউলকে প্রশ্ন করেছিলাম, কি দেবে তুমি আমাকে? মনে মনে কল্পনা করছিলাম, অমৃতলোকের বাণী নিয়ে ফিরব, শীর্ণ শরীর, কিন্তু জ্যোতির্ময়! পথের মধ্যে লোক ছিল না, কেবল একদল শেঠ, শেঠ বলেই মনে হ'ল তখন, মেলার দিকে চ'লে গেল। স্ত্রীলোকের সংখ্যাই বেশী, ছেলেও রয়েছে। তারা বোধ হয় স্নান ক'রে ফিরছিল। ওই পথের ধারে আর একটু আগে একটা 'তালাও' আছে, বেশ নির্জন। ভদ্রমহিলারা অনেকে নির্জন স্থানের সুবিধায় আর পুকুরে অবগাহন-স্নানের সুখে, ওখানে স্নান করতে যান। পেছনে তারা প'ড়ে রইল, জোর সংকল্প ক'রে দৃষ্টিকে সম্মুখে নিবদ্ধ ক'রে রেখেছিলাম। কিন্তু একখানা শাড়ির রং আমায় মুহুর্মুহুঃ পেছনের দিকে আকর্ষণ করছিল। গভীর লাল রঙের শাড়ি। শাড়ির অধিকারিণীকে লক্ষ্য করি নি, কিন্তু ওই রঙ, গাঢ় লাল রঙ, বড় ভাল লাগল। আমি ফিরে তাকাতে বাধ্য হলাম। কিন্তু তাদের আর দেখতে পেলাম না। মনের দ্বন্দ্বে অনেকখানি সময় কেটে গিয়েছিল; তাদের দেখতে পেলাম না, কিন্তু খেয়াল হ'ল, আমার ছড়িগাছটা তো নেই! এক্কার চারিপাশ খুঁজলাম, কোথাও না, ছড়ি নেই। এক্কাওয়ালাটাকে বললাম, থামাও এক্কা। সে গাড়ি থামালে। তাকে বললাম, আমার ছড়ি কোথায় ফেললি বেকুব? সামান্য ছড়ি, মূল্য দিয়ে আমি কিনিইনি। ওহো, তুই তো জানিস, মনে আছে তোর, আমরা দুজনে একসঙ্গে দুগাছা ছড়ি কেটেছিলাম? সেই ছড়ি নিয়েই বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলাম, দীর্ঘদিনের সঙ্গী সে আমার।

ছড়িটার কথা স্মরণ হইল, স্কুলে পড়িবার সময় আমরা দুইজনে দুইগাছা বাঁশের ছড়ি কাটিয়েছিলাম। আমার লাঠিগাছটি কোন্ দিন হারাইয়া গিয়াছে।

চন্দ্রনাথ বলিল, ভাবলাম, অনেক মমতা জড়িয়ে আছে ছড়িগাছটায়। ওটা আজ এই যাওয়ার পথে হারিয়ে যাওয়াই ভাল। নিঃশেষে মমতা মুছে যাক। কিন্তু মন মানলে না। এক্কাওয়ালাটা বললে, মায়-বাপ, আমি সামনে ব'সে গাড়ি হাঁকাচ্ছি, আমি কেমন ক'রে ছড়ির খবর জানব? কথাটা সত্যি। সে আবার বললে, হুজুর আমার বেশ মনে আছে, আপনি যখন মেলাটার শেষ দোকানে নেমে সওদা করলেন, তখনও আপনার ছড়ি এক্কার ওপরে ছিল। তা হ'লে ছড়ি আপনার মেলার পর থেকে এই রাস্তাটুকুর মধ্যে প'ড়ে থাকবে। কথাটা যুক্তিসঙ্গত। বললাম ঘুমাও এক্কা। ফিরলাম, মেলায় এসে পৌঁছে গেলাম। কিন্তু কোথায় ছড়ি? ছড়ি মিলল না। মেলার মুখে দাঁড়িয়ে ছড়িগাছটাকেই ভাবতে লাগলাম। বহুদিনের জীবনপথের দোসর আমার। আমার দেহের ভার বয়েছে, আমার মোট বয়েছে, কত পদস্খলন থেকে রক্ষা করেছে, কখনও বেইমানী করেনি, বিপদের সময় দূরে স'রে দাঁড়ায়নি।

বাবুজী! এক্কাওয়ালাটা বললে, বাবুজী, একজন শেঠ শুধু এই পথ ধরে গিয়েছে, আর কেউ যায়নি। তালাও থেকে তারা মেলায় এসেছে। আমার মনে হচ্ছে, তারাই ছড়িগাছটা কুড়িয়ে পেয়েছে।

আমার মনে প'ড়ে গেল, গাঢ় লাল রঙের শাড়ি; সঙ্গে সঙ্গে বললাম, চল মেলার মধ্যে, বের কর তাদের খুঁজে।

বেশ মনে আছে, নড়িয়া চড়িয়া ভাল হইয়া বসিয়াছিলাম। চন্দ্রনাথ প্রশ্ন করিয়াছিল, কি

রকম ? গল্প জ'মে উঠেছে বুঝি ?

হাসিয়া উত্তর দিয়াছিলাম, তাই তো মনে হচ্ছে—বলিয়া একটা সিগারেট ধরাইয়াছিলাম।

চন্দ্রনাথ বলিল, আমায়ও একটা দে।

বলিলাম, তোর ধর্মে তো ধূমপান নিষেধ।

সে বলিল, ধর্ম আমি মানি না। আমার ধর্ম আমার নিজস্ব।

সিগারেট ধরাইয়া সে বলিল, তা হ'লে আর এক কাপ ক'রে চা খাওয়া যাক। মীরা! মীরা!

মীরা আসিয়া বারান্দায় দাঁড়াইলেন।

চন্দ্রনাথ উঠিয়া গিয়া সাদরে বলিল, মেহেরবানি ক'রে আর দু কাপ চা ফরমায়েস যদি ক'রে দাও মীরা।—বলিয়া তাঁহার গালে একটি টোকা মারিয়া দিল। মীরা হাসিয়া চলিয়া গেলেন।

চন্দ্রনাথ আসিয়া বসিয়া আবার আরম্ভ করিল, কোথায় সে শেঠের দল ? মেলার মধ্যে তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজে তাদের বের করতে পারলাম না। সে রঙের শাড়িও আর চোখে ঠেকল না। তখন খুঁজতে আরম্ভ করলাম গাছতলা আর বড় বড় প'ড়ো বাড়িগুলো। যাকে পাই তাকেই জিজ্ঞাসা করি, আচ্ছা, একদল শেঠ—সঙ্গে মেয়েছেলে আছে—একজনের তার মধ্যে 'বহুত জিল্লাদার লাল রঙকা শাড়ি', কোথায় তাঁরা আছেন সন্ধান দিতে পারেন ? সবাই একটা সন্ধান দেয় ; কিন্তু সব ভুল। একটা বাঈজীর সারেঙ্গীদার, সে আমায় নিয়ে গিয়ে তুললে তার বাঈজীর আস্তানায়। যাকগে, শেষে হতাশ হয়ে ফিরলাম। হঠাৎ পথের পাশের একটা বড় বাড়ির বারান্দায় যেন দেখলাম সেই শাড়ির রঙ। নেমে পড়লাম। সন্ধান নিয়ে জানলাম একদল শেঠ সেখানে আছে, ওপরে দোতলায়। লাল শাড়িও আছে, 'হারাও' আছে—সব রকম রঙের শাড়িই সে দলে আছে! অনেক ভেবে একাওয়ালাটাকে ওপরে পাঠালাম। বহুত আদব-কায়দা পাখীর মত শিখিয়ে পড়িয়ে দিলাম। বললাম, হাতজোড় করে বলবি, অবশ্য যদি তাঁরাই হন—আগে ঠাওর ক'রে দেখে নিবি। বলবি, এক বাঙালীবাবুর একগাছা ছড়ি—অতি সামান্য একগাছা ছড়ি—ওই রাস্তায় গির গিয়েছে। যদি আপনাদের চোখে প'ড়ে থাকে—অতি সামান্য জিনিস—কোন 'কিম্মৎ' নেই তার—তবে তাঁর সেটাতে দরদ খুব বেশি। কথাটা অর্ধসমাপ্ত ভাবেই শিখিয়ে দিলাম।

বেয়ারা চায়ের সরঞ্জাম লইয়া আসিল। সঙ্গে সঙ্গে মীরাও আসিলেন। তিনিই চা করিয়া দিলেন। চন্দ্রনাথ উঠিয়া মীরাকে একান্তে ডাকিয়া ফিসফিস করিয়া কি বলিয়া দিল। দৃষ্টি ছিল কিন্তু আমার দিকে। পুলকিত হাস্যমুখে সে আসিয়া বসিল। মীরা চলিয়া যাইতেছিল।

চন্দ্রনাথ বলিল, দেখ, একটা হেজাক বাতি দিতে বল বেয়ারাকে।

চন্দ্রনাথ আবার আরম্ভ করিল, একাওয়ালাটা গেল, আমি নীচে অপেক্ষা ক'রে রইলাম। কিছুক্ষণ পরই নারীকণ্ঠের উচ্চ-হাসির আওয়াজ সেকালের গড়া বাড়িটার খিলেনে খিলেনে বেজে বেজে ফিরতে লাগল। একখানা হাসি যেন দশখানা হয়ে উঠেছিল। আমার মনের মধ্যে বাউল বৈরাগী থর থর ক'রে কেঁপে উঠল। একাওয়ালাটা ফিরে এসে বললে, হুজুর, আপনাকে তাঁরা সেলাম দিয়েছেন, আপনি উপরে যান। আমি কেমন অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতে লাগলাম। বেশ বিরক্ত হয়েই একাওয়ালাকে বললাম, তুই কি বেয়াদবি ক'রে এলি

বল তো ?

সে জোড়হাত ক'রে বললে, মায়-বাপ, কুছ না, কুছ না। আপনি যা বলতে ব'লে দিয়েছেন তাই বলেছি। আর তাঁরা তো 'গোসসা'ও করেননি। তাঁরা খুব হাসতে লাগলেন। বললেন, বাবুজীকে এখানে পাঠিয়ে দাও তুমি।

এই সময় বারান্দা থেকে একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক আলসের ওপর ঝুঁকে প'ড়ে বললেন, আসুন বাবুজী, মেহেরবানি ক'রে ওপরে আসুন।

তবু আমি ইতস্ততঃ করছিলাম। ভদ্রলোক নীচে নেমে এসে আমায় নিয়ে গেলেন। প্রথমেই তাঁর পরিচয় পেলাম, তিনি আগ্রা কলেজের প্রফেসার। ওপরে গেলাম। পা কাঁপছিল, ভয়ও হচ্ছিল, কি মনে করেছেন এঁরা! প্রশস্ত ঘর, ঘরের মধ্যে ফরাশ পেতে সব বসে আছেন। আমি ঘরে ঢুকতেই আবার সেই হাসি। ওপাশে জন-দুই পুরুষ বসেছিলেন, তাঁরাও মুচকে মুচকে হাসছিলেন। কয়েকজন বয়স্কা মহিলা সামনে প্রকাণ্ড বারকোশের ওপর প্রচুর ফল ছাড়িয়ে কেটে সাজিয়ে রাখছিলেন। আমি হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে রইলাম। তখন পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন একটি মহিলা, তাঁর পরনে রক্ত-রাঙা সেই শাড়ি। আমি ওপরের দিকে দৃষ্টি তুলতে পারিনি, পায়ের ওপর শাড়ির প্রান্তভাগ দেখে শাড়িটাকে চিনলাম।

চন্দ্রনাথের কথায় বাধা পড়িল। বেয়ারা একটা হেজাক বাতি আনিয়া টেবিলের উপর নামাইয়া দিল।

অত্যুজ্জ্বল আলোকের রূঢ় আঘাতে স্থানটার অন্ধকার যেন মন্ত্র-তাড়িতা মায়াবিনীর মত দূরে সরিয়া গেল। গঙ্গাবক্ষের স্বল্প-পরিসর স্থানও আলোকিত হইয়া উঠিল। চঞ্চল জল-তরঙ্গের মধ্যে ঝিকমিক করিয়া আলোকচ্ছটার প্রতিচ্ছটা নাচিতেছিল। বলিতে গেলাম, আলোটা সরাইয়া দাও, কিন্তু মুখ তুলিয়া সম্মুখেই দেখিলাম—মীরা, সন্ধ্যার সেই রাঙা শাড়ির সজ্জায় সজ্জিতা মীরা। তখনকার অস্ফুটালোকে যাহা লুকানো ছিল, এই ভাস্বর আলোকের মধ্যে তাহা সুপরিস্ফুট। মনে মনে উপমা খুঁজিয়া পাইলাম না।

চন্দ্রনাথ বলিল, এই সেই শাড়ি আর এই সেই নারী। ব'স মীরা, ব'স তুমি, তোমার আমার প্রথম দেখার কথা বলছি নরেশকে।

মীরা চন্দ্রনাথের মুখের দিকে চাহিলেন।

চন্দ্রনাথ বলিল, শোন নরু, রক্তাম্বরধারিণীই আমায় প্রশ্ন করলেন। হাসি-চাপা কণ্ঠস্বরে বললেন, বলুন তো বাবুজী আপনার কি হয়েছে, আমরা কিছু করতে পারি কি না দেখি!

বলতে বলতেই তিনি কলহাস্যে হেসে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে অপর সকলেও।

আমি যেন মাটির সঙ্গে মিশে গেলাম। তবু কোন রকমে বললাম, আমার একগাছা ছড়ি, নিতান্ত তুচ্ছ, অতি অল্পমূল্যের জিনিস, তবে আমার বহুদিনের সাথী—

লাল শাড়ির অধিকারিণী ব'লে উঠলেন, আপনি তো বহুত দরদ আদমী বাবুজী। এই ছড়ি, কি কিম্মৎ এর, কি বাহার এর, এরই ওপর আপনার এত দরদ ?

অপর মেয়েরা হেসে ভেঙে পড়ল। এ মেয়েটি তখনও বলছিল, তার কণ্ঠস্বরে পরিহাসের কণামাত্র রেশ ছিল না। সে বললে, তা হ'লে না জানি প্রাণের মানুষের ওপর আপনার কত দরদ!

আমি এবার মুখ তুলে চাইলাম। সম্মুখে দেখলাম—এই রূপ! কুমারী, কিশোরী, মুখে

চোখে তার অপরিসীম বিস্ময়, শ্রদ্ধা, আরও কত কিছু যেন ছিল! মুহূর্তে কি যেন হয়ে গেল! আমার বাউলের সমাধি হয়ে গেল। তোর কথাই ঠিক, কবরের পাশে সেই রূপের হাটে তার সমাধি, সে তার অক্ষয় স্বর্গবাসই বটে। কিন্তু মনের সিংহাসনে তখন যে এসে বসেছে, সে আমার অপরিচিত। কোথায় আমার মনের মধ্যে ছিল নীড়প্রিয় পাখী, গৃহকামী আদিম মানব, সেই হ'ল আমার রাজা। সেইখানে দাঁড়িয়ে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তরুণীর পানে চেয়ে কল্পনায় রচনা করলাম ঘরবাড়ি, সন্তান-সম্পদ, দাস-দাসী, সমস্ত নিয়ে সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকব আমি আর মীরা।

প্রফেসরটি বললেন, ইনি আমার মেয়ে—মীরা।

চন্দ্রনাথ নীরব হইল, দেখিলাম, মুগ্ধ দৃষ্টিতে সে মীরার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে।

মীরাও তাহারই দিকে চাহিয়া আছেন। আমি একটা সিগারেট ধরাইয়া গঙ্গার দিকে চাহিলাম।

কিছুক্ষণ পর মীরা বলিলেন, খাবার তৈরী হয়ে আছে, এখন কি—

চন্দ্রনাথ সচকিত হইয়া আমার দিকে চাহিল। তারপর কি হইল, প্রশ্ন করিতে আমার আর প্রবৃত্তি হইল না। জীবনে আপন জনের সঙ্গে প্রথম দেখা এবং প্রথম পরিচয়ই তো বাস্তব সংসারে কল্পকথা, শুভ দৃষ্টির মঙ্গলময় লগ্ন। তারপর যাহা কিছু সবই তো রূঢ়তার আঘাতে মলিন। কি হইবে সে কথা জানিয়া?

উঠিয়া পড়িলাম।

আট

পরের কথাটুকু সংগ্রহ করিয়াছিলাম মীরার নিকট হইতে। কৌতূহলী মন শিল্পী-জীবনের রীতি লঙ্ঘন করিল।

পরদিন প্রাতে চন্দ্রনাথ বোধ হয় কার্যোপলক্ষে বাহির হইয়া গিয়াছিল। মীরাকে বলিলাম, গৃহস্বামী যখন নেই, তখন গৃহস্বামিনীই অতিথি-আপ্যায়ন করুন। বসুন, একসঙ্গে বসে চা খাই।

শান্ত-হাসি হাসিয়া মীরা বসিলেন। প্রভাতালোকে আবার তাঁহাকে দেখিলাম—অপূর্ব রূপ! বোধ করি ক্ষাত্রযুগ হইলে, এ নারীর জন্য একটা যুদ্ধ হইয়া যাইত। চন্দ্রনাথের মনের বাউলের মৃত্যু, সৌভাগ্যের মৃত্যু; এই রূপের ছটায় তাহার মৃত্যু, তৃপ্তির মৃত্যু। বার বার কামনা করিলাম, যেন তাহার অক্ষয় স্বর্গবাসই ঘটে, সে যেন প্রেত হইয়া আর ফিরিয়া দেখা না দেয়।

শান্ত, অতি শান্ত রূপ সর্বদাই যেন একটা শঙ্কিত আচ্ছন্নতার মধ্যে ম্লান; তাহার সংস্পর্শে আসিয়া ব্যথিত না হইয়া উপায় নাই। বার বার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া সন্ধান করিলাম, কোথায় সেই জীবন-তরঙ্গময়ী নারী, যে একদিন অপরিচিত চন্দ্রনাথের মত পুরুষের সম্মুখেও দাঁড়াইয়া কলহাস্য তুলিয়া কৌতুক-প্রশ্ন করিয়াছিল, বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া বলিয়াছিল, না জানি প্রাণের মানুষকে আপনি কত ভালোবাসেন!

মীরা বলিলেন, আপনি অদৃষ্ট মানেন?

কেন বলুন তো? আশ্চর্য হইয়া প্রশ্নের উত্তরে প্রশ্নই করিয়া বসিলাম।

আমি মানি। আগে মানতাম না, এখন মানি।

কিসে আপনার অবিশ্বাস ভেঙে বিশ্বাস জন্মাল? চন্দ্রনাথের সঙ্গে বিবাহ কি?

হ্যাঁ। বাবা আমার শেঠ, কিন্তু ব্যবসা কখনও করেননি। সমস্ত জীবনে লেখাপড়াই ছিল তাঁর কাজ। আমাকেও তিনি লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন। তিনি নিজে ছিলেন নাস্তিক, আমিও ছিলাম নাস্তিক। কিন্তু বলুন তো আপনি, মেলার পথে সামান্য একগাছা ছড়ি, যার কোন বাহার নেই, কিস্মৎ নেই, সেটাকে পথের ওপর থেকে খেয়ালের বশে কেন কুড়িয়ে নিলাম! এমন তো কত প'ড়ে থাকে পথে! আর কি আশ্চর্য, আমিই সে গাছা কুড়িয়ে নিলাম! কি যে মনে হ'ল, কেন যে নিলাম, তার কোন জবাবদিহি আমি করতে পারি না।

তারপর মীরা যাহা বলিলেন, তাহা এই—চন্দ্রনাথ একদিনে তাহাদের সংসারের সহিত কত আপনার হইয়া গেল। মীরার পিতা ছিলেন উদার মানুষ, শেঠ হইয়াও লক্ষ্মীর সহিত সদ্ভাব তাঁহার ছিল না, সরস্বতীর উপাসক ছিলেন তিনি, চন্দ্রনাথের সহিত আলাপে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে ধরিয়া লইয়া গেলেন।

মীরা বলিলেন, দোস্ত্, যখন শুনলাম যে উনি গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী, তখন কান্না পেয়েছিল। বেরিয়ে গিয়ে লুকিয়ে কেঁদে এলাম। তারপর এসে আমি তাঁকে জোর ক'রে ধরলাম, না না, আপনি আমাদের সঙ্গে ফিরে চলুন। এত দরদ আপনার বুকে, সে দরদ আপনি মানুষকে না দিয়ে পাথরকে দেবেন, শূন্যের আরাধনায় ধূপের মত পুড়িয়ে ফেলবেন?

মীরার পিতা নাকি বলিয়াছিলেন, মেয়ে আমার ঠিক বলেছে বাবুজী।

মীরা বলিলেন, তারপর বাবা বললেন, আপনি বাঙালী, আপনাদের কবির কাব্য তো তা বলে না। তিনি তো বলেছেন—। এখানে কি একটা কবিতা বাবা আবৃত্তি করিলেন, তার অর্থ বৈরাগ্যের মধ্যে যে মুক্তি—

আমি হাসিয়া বলিলাম, ও, "বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, সে আমার নয়!"

মীরা বলিলেন, হ্যাঁ।

প্রশ্ন করিলাম, তারপর?

তারপর?

মীরার দৃষ্টি যেন স্বপ্নাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। যৌবনে মানুষ যে দৃষ্টিতে বাল্য-জীবনের দিকে ফিরিয়া তাকায়, প্রৌঢ়ত্বের সীমায় দাঁড়াইয়া যে মমতা লইয়া যৌবনের স্বপ্ন দেখে, সেই মমতামাখা দৃষ্টি মীরার চোখে।

মীরা বলিলেন, তারপর আপনার দোস্তের সঙ্গে কত প্রগাঢ় পরিচয় হয়ে গেল। কেমন ক'রে যে এক বিদেশী আমার জীবনে আনন্দের 'রোশনাই' হয়ে উঠল, জানি না, বলতে পারি না।

তারপর চন্দ্রনাথ নাকি একদিন তাঁহার পিতার কাছে মীরাকে প্রার্থনা করিল।

মীরার পিতা উদার এবং আধুনিক হইলেও এ বিবাহে সম্মতি দিতে পারিলেন না। চন্দ্রনাথ আসিয়া মীরার নিকট বিদায় চাহিতেই মীরা তাহার হাত ধরিয়া নিঃসঙ্কোচে গৃহত্যাগ করিয়া পথের উপর আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন।

মীরা বলিলেন, তামাম দুনিয়া, ইহকাল পরকাল, সমস্ত সেদিন আমার প্রিয়তমের তুলনায় ছোট হয়ে গেল, দোস্ত!

সহসা কৌতূহলের বশবর্তী হইয়া ভদ্রতার, বোধ করি শীলতারও, সীমা লঙ্ঘন করিয়া ফেলিলাম। প্রশ্ন করিয়া বসিলাম, আজ? আজও কি তাই?

মীরা যেন চমকিয়া উঠিলেন, অন্তত এতক্ষণে তিনি ঈষৎ চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। তারপর কহিলেন, হ্যাঁ, আজও তাই, হ্যাঁ।

তাঁহার নিজের কথাটা তিনি যেন নিজেই পরখ করিয়া দেখিলেন। কথা শেষ করিবার পরও তিনি বার দুই সায় দিয়া ঘাড় নাড়িলেন।

আমি বুঝিলাম, সে নারী আর নাই! জীবনের তরঙ্গ সে পিছনে ফেলিয়া আসিয়াছে। কিন্তু সাগরের বুকে নদীর মতো সে নিঃশেষে লীন হইয়া গেল, না কোন গিরি-গহ্বরের পাষাণ বেষ্টনীর ভিতরে পড়িয়া সে হারাইয়া গেল, বুঝিলাম না। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া প্রশ্ন করিলাম, তারপর?

মীরা বলিলেন, তারপর তাঁর খেয়াল হ'ল, শিখ হবেন তিনি। আইনমতে রেজেস্ট্রি ক'রে বিবাহে তাঁর প্রবৃত্তি হ'ল না। আমার তো 'দোসরি' ইচ্ছা ছিল না। গুরু-দোয়ারায় আমরা শিখ হয়ে গেলাম, শিখমতেই আমাদের বিবাহ হয়ে গেল।

আবার প্রশ্ন করলাম, তারপর?

উসকে বাদ?

শুধু আমার প্রশ্নটির পুনরুক্তি করিয়াই মীরা নীরব হইলেন। দেখিলাম, সুদূর-প্রবাহিণী গঙ্গা যেখানে দিগন্তরেখায় আকাশের বুক চিরিয়া বাহির হইয়া আসিতেছে, সেইখানে তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ।

আর প্রশ্ন তুলিতে পারিলাম না।

নীরবেই উভয়ে বসিয়াছিলাম, এমন সময় ভিতরে চন্দ্রনাথের শিশু কাঁদিয়া উঠিল। মীরা তাড়াতাড়ি উঠিয়া গেলেন।

ছেলেকে কোলে লইয়া বাহিরে আসিয়া আমাকে বলিলেন, আপনাদের 'দুষ্টু' কথাটি ভারী মিষ্টি!

দুষ্টু, আমার দুষ্টু!—বলিয়া ছেলেকে তিনি আদর করিলেন।

আমি বলিলাম, ছেলে দুষ্টু না হ'লে ভাল লাগে না!

শিশু চিৎকার করিয়া কাঁদিতেছিল, মীরা বলিলেন, ছেলে নিয়ে কিন্তু বড় হাঙ্গামা। এক-এক সময় মনে হয়, ছেলে মানুষের না হওয়াই ভাল।

তিনি ছেলেটিকে লইয়া ভিতরে চলিয়া গেলেন।

ইহার কয়েক মিনিট পরেই চন্দ্রনাথ ফিরিয়া আসিল। মোটর বাইকটাকে ঠেলিয়া ভিতরে আনিয়া অনাবশ্যক ক্ষিপ্রতার সহিত ফটকটা পিছনের দিকে ঠেলিয়া দিল। লঘু দ্রুতপদে বারান্দায় আসিয়া উঠিল। টেবিলের উপর এক প্যাকেট সিগারেট ফেলিয়া দিয়া বলিল, নে, খা।

নিজেও একটা সিগারেট বাহির করিয়া লইয়া সে চঞ্চল পদবিক্ষেপে ভিতরে প্রবেশ করিল। যেন অনাবশ্যক একটা গতির সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে সে।

শুনিতে পাইলাম, সে বলিতেছে, আর একবার চা আমাদের দাও তো মীরা। আর, ববুয়ার নাম ঠিক ক'রে ফেললাম, নাম হবে জিঞ্জির সিং।

মীরার বিস্মিত কণ্ঠের উত্তর শুনিলাম, জিঞ্জির সিং!

হ্যাঁ, কিম্বা বন্ধন সিং।

আমিও বিস্মিত হইয়া উঠিলাম। মীরার কণ্ঠস্বর আর শুনিতে পাইলাম না। চন্দ্রনাথ বাহিরে আসিয়া আমার পাশে বসিল, বলিল, আবার নতুনভাবে জীবন আরম্ভ করব নরু—এ নিউ স্টার্ট।

উত্তর কি দিব, নীরবে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলাম।

চন্দ্রনাথ বলিল, এখানকার কারখানা আমি বেচে ফেলছি। এইবার এমন একটা কিছু করব; প্রকাণ্ড বড় একটা কিছু—এ বিগ স্কিম। বড় কিছু রচনা করব আমি, মস্তবড় এক মধুচক্র, যাকে কেন্দ্র ক'রে গুঞ্জন করবে হাজার হাজার মানুষ মধুমক্ষিকার মত।

আমি বলিয়া উঠিলাম, না না না। চন্দ্রনাথ, এমন কাজ করিসনি। একটা প্রতিষ্ঠিত কারবার—

চন্দ্রনাথ বলিয়া উঠিল, সে হয় না নরু, আমি অনেক ভেবে এ করছি। এত বড় সুন্দর পৃথিবী, বিধাতার প্রতিবিম্ব হয়ে এখানে এলাম, আমি কিছু সৃষ্টি করব না? কিছু রেখে যাব না? আমি এই ভাবে প'ড়ে থাকব নরু, এ কি তুই কল্পনা করতে পারিস?

তারপর একটু হাসিয়া বলিল, তোরা হয়ত সবই পারিস, কারণ এইখানেই নাকি জীবনের সব চেয়ে বড় ট্র্যাজেডি।

মীরা চা লইয়া আসিলেন, নীরবে চা প্রস্তুত করিয়া দিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন, চন্দ্রনাথ বলিল, এখানকার কারখানা বেচে ফেলছি মীরা।

মীরা চন্দ্রনাথের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, তারপর বলিলেন, বেশ।

তারপর ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন।

চন্দ্রনাথ তাঁহার গমনপথের দিকে চাহিয়া বলিল, মীরা অদ্ভুত! বিবাহের পূর্বে মীরা প্রগল্‌ভা ছিল, চঞ্চলা ছিল, কিন্তু বিবাহের পর থেকে আশ্চর্য রকমের শান্ত হয়ে যাচ্ছে দিন দিন। কোন অভিমান নেই, বিরোধিতা নেই, চাঞ্চল্য নেই। অথচ ও যদি বিরোধিতা করত, তবে হয়তো—

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, জানিস নরু, বহুদিন থেকে অন্তরে আমার বিপ্লব আরম্ভ হয়েছে। বিবাহের পর ছোট একখানি বাড়িতে মীরাকে নিয়ে নীড় বেঁধেছিলাম। কর্মজীবনের আর দৈনিকজীবনের কিছু সঞ্চয় ছিল, ভেবেছিলাম, তাই দিয়ে জীবন বেশ কেটে যাবে। সেদিন মনে আর কোন কামনা ছিল না। কিন্তু ধীরে ধীরে মন অশান্ত হয়ে উঠতে লাগল, ক্ষুদ্র একটুখানি গণ্ডির মধ্যে একটি নারীর মুখ চেয়ে ব'সে থাকব? টাটার স্মৃতি, যন্ত্ররাজ্যের গর্জন, যুদ্ধের বাজনা—মনে পড়তে লাগল। ঠিক এই সময় থেকেই মীরার এই পরিবর্তন আমার চোখে পড়ল। আমি যত অশান্ত হয়ে উঠছি, ও হয়ে উঠছে তত শান্ত। ও যদি মুখরা হ'ত, চঞ্চলা হ'ত, লঘু হ'ত, আমি ওকে ফেলে স্বচ্ছন্দে বেরিয়ে পড়তে পারতাম। কিন্তু মীরার দ্বন্দ্বকৌশল অদ্ভুত। কোনও দিন মীরাকে পরাজিত করতে পারলাম না।

আমি বললাম, দেখ, মীরার ইচ্ছা ছিল—খোকার নাম থাকবে কুমারকিশোর। নামের মধ্যে কোন অর্থ না থাকাই ভাল চন্দ্রনাথ, কি বলিস?

চন্দ্রনাথ ডাকিল, মীরা, মীরা!

মীরা আসিয়া দাঁড়াইলেন। চন্দ্রনাথ বলিল, বস তুমি মীরা।—বলিয়া সে নিজেই একখানা চেয়ার নিজের চেয়ারের সম্মুখে পাতিয়া দিল। তারপর মীরার হাত ধরিয়া বলিল, খোকার নাম রাখতে চাও তুমি—কুমারকিশোর?

মীরা বলিলেন, জিঞ্জির নামও বেশ, সোনেকা জিঞ্জির—স্বর্ণ-শৃঙ্খল জীবনে।

চন্দ্রনাথ বলিল, না, কুমারকিশোরই ভাল।

পুলকিত হইয়া মীরা বলিলেন, উ নামও বহুত আচ্ছা নাম।

চন্দ্রনাথ বলিল, শোন মীরা, এখানকার কারখানা বেচে ফেলছি, ঘরই যখন বেঁধেছি, তখন প্রাসাদের মতো ঘর গ'ড়ে তুলব, প্রতি কোণে তার ঐশ্বর্য থাকবে। প্রকাণ্ড বড় কারখানা করব, হাজার হাজার লোক যেখানে প্রতিপালন হবে, এমনই এবার কিছু করব। তুমি কি বল?

শ্রদ্ধান্বিত বিস্ময়ে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া মীরা বলিলেন, সে খুব ভাল হবে।

আমি বার বার নিজেকে অপরাধী মনে না করিয়া পারিলাম না।

কিন্তু লক্ষ্য করিলাম, চন্দ্রনাথ আর অস্বাভাবিক গম্ভীর নয়, সে চঞ্চল উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে। বুঝিলাম, তাহার কল্পনানেত্রে আকাশে ফুল ফুটিতেছে। পরদিন প্রভাতে বাহিরে বসিয়া ওই কথাই ভাবিতেছিলাম। চন্দ্রনাথ ছেলেকে কোলে লইয়া বাহিরে আসিয়া বলিল, কাল রাত্রিটা বড় সুখের গেছে নরু; বহুদিন আমরা এমন গাঢ় মিলন-রাত্রি উপভোগ করিনি।

আমি বলিলাম, সুখ তো মনেই চন্দ্রনাথ। আর একটা কথা, সহজ স্বাভাবিক জীবনেই সুখ কেবল পাওয়া যায়। অস্বাভাবিক জীবনই অশান্তির মূল। এই শিশু আর মীরার মত স্ত্রী, এদের কেন তোর জীবনের অশান্তিতে দগ্ধ করবি?

শিশুকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া সে বলিল, আমার ববুয়া, আমার মীরাকে সুখে রাখবার জন্যেই তো আমার আয়োজন।

ঘাড় নাড়িয়া বার বার অস্বীকার করিয়া বলিলাম, না না। হয় তুই আমাকে প্রতারণা করছিস, নয় তুই নিজেকে নিজে প্রতারণা করছিস!

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া সে উঠিয়া ভিতরে চলিয়া গেল। ছেলেটিকে তাহার মায়ের কাছে দিয়া আসিয়া বলিল, প্রতারণা কাউকেই আমি করিনি। আমি তো বলেছি, এই সুন্দর পৃথিবীতে আমি কিছু সৃষ্টি করব না? কিছু রেখে যাব না? আর যা রেখে যাব, সে তো আমার ববুয়ারই থাকবে।

সে আবার যেন অস্বাভাবিক গম্ভীর হইয়া উঠিতেছে। আমি আর প্রতিবাদ করিলাম না।

ছেলের অন্নপ্রাশন হইয়া গেল। হিন্দুমতে বাঙালীর অনুষ্ঠান পালন করিয়া সমাপ্ত হইল। ছেলের মামা সাজিতে হইল আমাকে। আমি তাড়াতাড়ি ছুটিলাম বাজারে। থালা, বাটি, গ্লাস, আসন, খোকনের জামা, পোশাক, সোনার গহনাও কিছু কিনিয়া আনিলাম, তবুও মন খুঁতখুঁত করিতে লাগিল, কোমরপাটা ও তক্তি পাইলাম না।

চন্দ্রনাথ দেখিয়া আমার কান ধরিয়া টানিয়া বলিল, আমার শালা সাজবার সেলামি নাকি? এ কিন্তু তুই ভারী অন্যায় করলি।

আমিও তাহার কান ধরিয়া বলিলাম, ভগ্নীপতির অনধিকার-চর্চার এই হচ্ছে পুরস্কার।

আমাদের কাণ্ড দেখিয়া মীরা মৃদু মৃদু হাসিতেছিল।

সে বাঙালী মেয়ের মত শাড়ি পরিয়া আমার পায়ের ধুলা লইয়া প্রণাম করিল।

আমি মনে মনে অনেক চিন্তা করিয়া আশীর্বাদ করিলাম, ধরিত্রীর মত সহনশীলা হও তুমি, মৃত্যুর মত শক্তিশালিনী হও, তুমি বিজয়িনী হও।

নয়

ইহার পর চন্দ্রনাথ আবার নিরুদ্দেশ। মনের আকাশ পাতিপাতি করিয়া খুঁজিয়াও আমার কল্পলোকের কালপুরুষ নক্ষত্রের সন্ধান মেলে না।

ফিরিয়া আসিয়াই চন্দ্রনাথকে পত্র দিলাম। উত্তর দিল মীরা। সুন্দর হস্তাক্ষরে ইংরেজীতে পত্রখানি লিখিয়াছিল। জানিলাম, চন্দ্রনাথ কানপুরের কারখানা বেঁচিয়া ফেলিয়াছে। কোন এক বিশিষ্ট মাটির জায়গা দেখিবার জন্য সে কোথায় গিয়াছে, এখনও ফেরে নাই। আমাকে নাকি মীরার প্রায়ই মনে পড়ে।

সে লিখিয়াছিল, আমার রক্তের সম্বন্ধের আত্মীয়স্বজনকে ভুলিয়াছি; কিন্তু যে দোস্তকে বিধাতা ভাই সাজাইয়া পাঠাইয়া দিলেন, তাহাকে ভুলিতে পারিতেছি না।

উত্তরে আবার পত্র দিলাম, লিখিলাম, বহিন, আমাকে রাখী পাঠাইয়া দিও এবার। কিন্তু সে পত্র ডেড-লেটার অফিস হইতে ফিরিয়া আসিল। সেদিন আমার চোখে জল আসিয়াছিল। মীরা চন্দ্রনাথ হারাইয়া গেল ধরণীর জনারণ্যে; কিন্তু আমার চিত্তলোকে তাহারা হইয়া উঠিল প্রধান।

মীরা ও চন্দ্রনাথের কাহিনী রচনা করিবার জন্য আমি পাগল হইয়া উঠিলাম। আহার নিদ্রা ঘুচিয়া গেল। এক কাহিনী তিনবার লিখিলাম, কিন্তু মনোমত হইল না। মেসের বন্ধুরা বলিত, ভদ্রলোক এইবার পাগল হয়ে যাবে।

পরিণতি কল্পনা করিতে না পারিয়া চন্দ্রনাথের কাহিনী রচনার চেষ্টা ত্যাগ করিলাম। প্রত্যক্ষের অপেক্ষা করিয়া আছি।

আঃ, আবার জানালাটা খুলিয়া গেল। এক ঝলক তীক্ষ্ণ-শীতের বাতাস দেহটাকে কাঁপাইয়া দিল। চিন্তাসূত্রও ছিন্ন হইয়া গেল। খোলা জানালা দিয়া পথ-প্রদীপের আলো আসিয়া আমার মনশ্চক্ষুর সম্মুখে রহস্যময় ছায়াপটখানি ছিন্ন করিয়া দিয়াছে।

জানালাটা ছিটকিনি আঁটিয়া বন্ধ করিবার সংকল্প লইয়া উঠিলাম। খোলা জানালাটা দিয়া চোখে পড়িল, শহরের ধোঁয়া ও আলোর আবরণের নৈশ আকাশ অস্পষ্ট। কোটি কোটি বৎসরের তপস্যার মত কত অসংখ্য নক্ষত্র যে আলোকের বার্তা পৃথিবীর বুকে পাঠাইয়াছে সে আলোক ঐ আলোকিত ধূমচন্দ্রাতপের আড়ালে হারাইয়া গিয়াছে। শুধু পশ্চিম-গগন-প্রান্তে ঐ চন্দ্রাতপ বিদীর্ণ করিয়াও ধকধক করিয়া জ্বলিতেছে—ভেনাস, শুকতারা। কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া দেখিলাম—স্নিগ্ধ জ্যোতির্ময়, ঈষৎ নীলাভ জ্যোতি। জানালাটা বন্ধ করিয়া দিয়া আবার আসিয়া বসিলাম। অন্ধকার কক্ষ, মনের ছায়াপট যেন কায়া গ্রহণ করিয়া ঘরের মধ্যে মূর্ত হইয়া উঠিতেছে।

কালো ও সাদা রঙের পক্ষপুটে ভর করিয়া কাল উড়িয়া চলিয়াছে। দুই বৎসরের দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া সে আমার মন-বনস্পতির শীর্ষদেশে বিশ্রাম করিল।

ও কে? ছায়াপটের রহস্য যে ঘন হইয়া উঠিল।

পুষ্পিত বসন্ত-দিবসের মত বর্ণে সুষমায় উজ্জ্বল লাবণ্যময় তনু, বহুমূল্য-পরিপাটি কোঁচানো ধুতি পরনে, গায়ে গিলা-করা পাঞ্জাবি, গলার চাদর মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়াছে, ঘাড়টি ঈষৎ

বাঁকাইয়া দাঁড়াইয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছে—ও যে হীরু। হীরু আসিয়াছে! হীরু! হীরু! উঃ, বহুকাল পরে দেখা তোর সঙ্গে হীরু! বিলেত থেকে কবে ফিরলি তুই?

এমনই অকল্পিত রহস্যের মতই হীরু সেদিন আমার মেসে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। আমি তাহাকে ওই প্রশ্নই করিয়াছিলাম।

সে নারীর মত মধুর হাসিয়া বলিল, আজি রজনীতে হয়েছে সময় এসেছি বাসবদত্তা। তবে রুজার বাগানের বকুলের সংবাদ জানি না বন্ধু।

সে আমার সেই মেসের ঘরে ময়লা বিছানার উপর চাপিয়া বসিল।

আমি অবাক হইয়া তাহাকে দেখিতেছিলাম, তাহার উজ্জ্বল বর্ণ উজ্জ্বলতর হইয়াছে, পরিচ্ছদ হইতে সুমিষ্ট পুষ্পসারগন্ধে সমস্ত ঘরখানা ভরিয়া উঠিয়াছে।

হীরু বলিল, বহুকাল পরে এল যে অতিথি, তাহাকে মর্মরসে যদি অভিষিক্ত করতে না-ই পারিস নরু, তবে বস্তুজগতের মিষ্টরসেও তো আপ্যায়ন করা উচিত। চা আনতে বল।

তাহাকে এবার বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলাম, অবাক হয়ে গেছি ভাই; কিন্তু কতকাল পর বল তো? এ হ'ল উনিশশো—

হীরু বলিল, কি হবে সে হিসেব ক'রে? হিসেব আমার নেইও। পৃথিবীর বুকে আমি একান্তভাবে অতিথি, যাওয়া-আসার তিথির সংবাদ না মেনে চলাই আমার নিয়ম।

পৃথিবীর সমস্ত বস্তু এবং ঘটনাকে একান্ত লঘুভাবে গ্রহণ করার এক ধারার দার্শনিকতা প্রচলিত আছে, এই ধারাকে নিজের জীবনে খাপ খাওয়াইয়া লওয়ার মধ্যে কতখানি শক্তির প্রয়োজন বলিতে পারি না, কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রকাশভঙ্গির মধ্যে একটা অভিনবত্ব আছে সন্দেহ নাই, তবুও হীরুর কথাটার মধ্যে বেদনার আভাস পাইলাম।

হীরুর বেদনার কথা মনে করিতেই আমার নিজের বেদনা ঘনায়িত হইয়া উঠিল। মনে পড়িয়া গেল মাকে। তবুও আজ তাহার বেদনাকেই বড় করিলাম, বলিলাম, সবই জানি, সে সময় তোর আসবার কথাও শুনে এসেছিলাম, সেই সময়েই কি তুই এসেছিস?

একটা সিগারেট ধরাইয়া সে বলিল, এসেই চলে গিয়েছিলাম। বললাম তো, আমি একান্তভাবে অতিথি। অতিথি শুধু তিথির নিয়ম লঙ্ঘন করেই চলে না, কালের বন্ধনই সে শুধু মানে তা নয়, স্থানের বন্ধনও তার পক্ষে নিষেধ। দেশ ভালো লাগেনি, চ'লে গেলাম ফের। আবার এই কিছুদিন ফিরেছি। নে, সিগারেট নে।

বহুমূল্য সিগারেট-কেস হইতে একটা সিগারেট তুলিয়া লইয়া বলিলাম, এইবার একটি পরম শুভ তিথি এবং লগ্ন দেখে জগতে অতিথি নামটা খণ্ডন ক'রে ফেল হীরু, রূপসীর রূপের মধ্যে ও রূপের তোর অবসান হোক।

হীরু হাসিয়া বলিল, রূপকে আমি পূজা করি, রূপসীর প্রতি আমার মোহ আছে। তবে ভয় করি তাদের মমতাকে; তাদের ললিত ভুজলতার বন্ধন খোলা যায়, কিন্তু তাদের জীবনের কোমলতার বন্ধন ছিঁড়ে না ফেললে আর উপায় নেই। তাদের কায়াকে ভয় তো করি না নরু, ভয় করি তাদের মায়াকে। কিন্তু তুই চা দিবি না মনে হচ্ছে, উঠি আমি।

তাড়াতাড়ি উঠিয়া স্টোভটা ধরাইয়া ফেলিলাম। কেটলিতে জল ভরিয়া সেটা চড়াইয়া দিয়া চায়ের সরঞ্জাম পাড়িয়া বসিলাম।

বলিলাম, কেন, তোর মনের বনে যে লতা সযত্নে রোপণ ক'রে পরিচর্যা করছিলি,

তাতে কি ফুল ধরল না ?

সে বলিল, তোর মনে আছে সে কথা ? সে তো একটি লতা নয়, সে যে লতার দল, কিন্তু আমার মন-বনস্পতি যে, দিন দিন উর্ধ্বে উঠে চলেছে ওদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলে। তারা নাগাল পেলে না, তাই লজ্জায় খ'সে পড়ল। উপস্থিত মনের গহন লতাশূন্য। নাঃ, আর ও বীজ বপনই করব না। তোর অঙ্গও তো অনাবৃত শুনেছি, তুইও তো বিয়ে করিস নি।

হাসিয়া বলিলাম, না। কিন্তু তোর কাকা যে তোর বিয়ে না দিয়ে ছাড়লেন ? কেমন আছেন তিনি আজকাল ?

অভ্যাসমত ভঙ্গিতে হীরু উত্তর দিল, কাল তাঁর নাগাল পায় না, মহাকালের দরবারে তিনি এখন জমিদারিই করছেন বোধ হয়। না না, তার জন্যে মিথ্যে আক্ষেপ করিস নি নরু। তিনি রেহাই পেয়েছেন ভাই। তাঁর দিকে চাইলে আমারও দুঃখ হ'ত। দেশের লোকের কাছে তিনি অমানুষ ছিলেন ; কিন্তু আমার কাছে—

আর সে বলিতে পারিল না। কয়েক মিনিট নীরব থাকিয়া আবার সিগারেট ধরাইয়া সে বলিল, আমার সঙ্গে তোকে একবার দেশে যেতে হবে নরু। চল, কিছুদিন হৈ হৈ ক'রে আসা যাক। একটা মেলা বসাচ্ছি দেশে, খুব বড় মেলা করব, কলকাতা থেকে থিয়েটার, সিনেমা, সার্কাস নিয়ে যাব।

প্রশ্ন করিলাম, কি ব্যাপার, মেলা হঠাৎ, উপলক্ষ্য কি ?

গাজন—বর্ষশেষের উৎসব। দেবদেবীকে শাস্ত্রে বিশ্বাস নেই, কিন্তু মৃত্যুতে আমার শ্রদ্ধা আছে। বর্ষের অবসান উপলক্ষ্যে মৃত্যুকে অভিনন্দিত ক'রে একটা উৎসব করবার অনেক দিন থেকে আমার সংকল্প।—মৃত্যুর উপাসনা।

হাসিয়া বলিলাম, সেই উপাসনা ক'রেই তো আমাদের আজ এই অবস্থা।

আচার্যদের বুলি আওড়াচ্ছিস ? কিন্তু আমাকে বাদ দে ভাই। কেন জানি না, মৃত্যুর প্রতি আমার একটা মোহ আছে। নিজে মরতে পারি না—শুধু মৃত্যুর লীলার বহু রূপ প্রত্যক্ষ করতে চাই। যাকগে, আর একটা কথা শোন, আমি একটা ফিল্মের ব্যবসা করব ভেবেছি। একটা স্টুডিও হাতে এসে পড়েছে, কিন্তু ছবির উপাখ্যান আমার মনোমত হচ্ছে না। তুই লিখে দিবি ? মিহিরকুলকে নিয়ে অদ্ভুত দৃশ্য হবে রে, যেখানে পাহাড় থেকে হাতীগুলোকে একে-একে ফেলে দিয়ে তাদের মরণ-চীৎকার শুনে মশালের আলোয় মিহিরকুল নাচছে।

চা তৈয়ারী করিয়া তাহাকে একটি কাপ আগাইয়া দিয়া বলিলাম, বিলেতে থেকে কি এই সস্তা জিনিসগুলো নিয়ে এলি তুই ?

আবার চায়ের জল বসাইয়া দিলাম।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়া সে বলিল, সস্তা জিনিসের একটা যে বড় মূল্য নরু, তার পেছনে হার-জিতের অনুশোচনা নেই। পর্যাপ্ত পরিমাণে মুড়ি খেয়ে যদি শরীর না-ই সারে, তবে আক্ষেপ হয় না। কিন্তু সিমলে পাহাড়ে গিয়ে আঙুর-বেদানার রসে—

উপমা শুনিয়া হাসিয়া ফেলিলাম। বলিলাম, যাকে বলে—বিলিতী ফক্কড়, তাই হয়ে এলি তুই !

হীরু বলিল, যাকগে। ফিল্মের কথা পরে হবে। এখন আমার সঙ্গে দেশে যাবি কি না বল ?

দেশে যেতে আপত্তি নেই, কিন্তু মেলায় আপত্তি আছে আমার। কেন বাজে অনেকগুলো অর্থ অপব্যয় করবি বল ?

হীরু বলিল, অপব্যয় কথাটায় আমার আপত্তি আছে, ব্যয় বল। কিন্তু আমার টাকা যে অনেক জ'মে আছে নরু। জানিস তো, মামার বাড়ির সমস্ত সম্পত্তিও আমি পেয়েছি ?

চমকিয়া উঠিয়া বলিলাম, কেন ? তোর তো তিন মামা ছিলেন, তাঁদের ছেলেপিলেও ছিল—

হ্যাঁ, কিন্তু মৃত্যু-দেবতার আমি উপাসক ব'লেই নাকি তিনি তাঁদের আমার পথ থেকে সরিয়ে দিয়েছেন। তাঁদের কলকাতার সম্পত্তি যথেষ্ট, কিন্তু তার চেয়েও বেশি ছিল নগদ টাকা। হপ্তাখানেক আগে হিসেব দেখলাম, আঠারো লাখ টাকা তাঁদের মজুত। আর আমার পৈতৃক মজুত, তাও লাখ তিনেক হবে। টাকাটা তো ব্যয় করতে হবে !

আমি স্তম্ভিত হইয়া ভাবিতেছিলাম, হতভাগ্যের ভাগ্যের কথা। সে আমাকে একটা সিগারেট দিয়ে নিজেও একটা ধরাইয়া লীলাচ্ছলে ধোঁয়ার রিং ছাড়িতে আরম্ভ করিল। আমি অবশেষে বলিলাম, ব্যয় করতেই হবে, তার মানে কি হীরু ? তোর পর তোরও উত্তরাধিকারী কেউ না কেউ থাকবেই, এ যে তার অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে।

সে বলিল, ভুল বলছিস তুই। আলোর উত্তরাধিকারী অন্ধকার, জন্মের উত্তরাধিকারী মৃত্যু, লালসার উত্তরাধিকারী বৈরাগ্য, সে হিসাবে সঞ্চয়ের উত্তরাধিকারী হচ্ছে ক্ষয়, এবং সেইজন্যেই আমার হাতে এসে পড়েছে এত বৈভব।

সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রনাথের কথা মনে পড়িয়া গেল। কিন্তু তাহার কথা বলিতে কেমন দ্বিধা হইল। কথাটা একটু ঘুরাইয়া পাড়িলাম, বলিলাম, বেশ তো, ঐ টাকা দিয়ে বড় একটা কিছু গ'ড়ে তোল না।

সে হাসিয়া বলিল, এবার কাকার মৃত্যুর পর দেশের লোকে ধরেছিল একটা শ্মশানাশ্রমের জন্যে, কিন্তু দিইনি। শ্মশানে আবার গৃহকোণের সৃষ্টি করা কেন ?

বুঝিলাম, সে বুঝিয়াও আমার কথাটা এড়াইয়া যাইতেছে। বলিলাম, ওরে, তোর চালাকি আমি বুঝি। তুই এড়িয়ে যাচ্ছিস আমাকে। আমি বলছি, কোন একটি উৎপাদনকারী শিল্পের কারখানা, বড় একটা কিছু, তোর ফিল্মের ব্যবসার চেয়ে অনেক বড় কিছু গ'ড়ে তোল না।

তাচ্ছিল্যভরে সে বলিল, দূ-র ! ঝঞ্ঝাট পোয়াবো না। কে এত পরিশ্রম করে ! দেখ দেখ, চায়ের জল প'ড়ে যাচ্ছে।

কেটলিটা স্টোভের উপর হইতে নামাইয়া ফেলিলাম। আবার চা তৈয়ারি করিয়া তাহাকে এক কাপ দিয়া নিজেও এক কাপ লইয়া বসিলাম।

তারপর বলিলাম, চন্দ্রনাথ এমনই বড় একটা কিছু গ'ড়ে তোলবার জন্যে পাগল। তুই তাহাকে সাহায্য কর না, মূলধন দিয়ে অংশীদার হয়ে যা।

সে ব্যগ্রভাবে বলিয়া উঠিল, চন্দ্রনাথ ! কোথায় সে, সে আজও বেঁচে আছে ?

বলিলাম, তার চরিত্র অনুযায়ী সে দুর্দান্তভাবেই বেঁচে আছে। কিছুদিন আগেই তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

ধীরে ধীরে চন্দ্রনাথের কাহিনী হীরুকে বলিয়া শেষ করিলাম।

হীরু বলিল, চন্দ্রনাথ ব্রিলিয়াণ্ট ! কিন্তু যুদ্ধ তার ভাল লাগল না কেন ? চন্দ্রনাথ এত দুর্বল !

এ কি দুর্বলতা হীরু? জীবনের অপচয়, সৃষ্টির অপচয় ক'রে যে ধ্বংসলীলা, সে কি মানুষের ভাল লাগে, না লাগা উচিত?

কে জানে! কিন্তু আমার মনে হয়, এ ভাল না লাগার মূলে হ'ল মানুষের মৃত্যুভয়, নিজের জীবনের মৃত্যুভয়।

তাহার সহিত আলোচনা করিতে প্রবৃত্তি আমার হইল না। কথাটা এড়াইয়া গিয়া বলিলাম, যাকগে ও কথা, কিন্তু যা বললাম, তার কি হ'ল? কিছু মূলধন দিয়ে চন্দ্রনাথের অংশীদার—

বাধা দিয়া সে বলিল, পোষাবে না। অংশীদার হওয়া, কি ঋণ দেওয়া—ও হ'ল ঝঞ্ঝাট বাড়ানো, অঙ্কশাস্ত্রে অধিকার আমার চিরদিনই কম। সুদ কষা, কি লাভ-লোকসানের হিসেব করা আমার বিদ্যেবুদ্ধির অতীত নয়। তার চেয়ে চন্দ্রনাথকে বন্ধুর উপহার ব'লে—

বাধা দিয়া বলিলাম, থাক হীরু, কথাটা আর উচ্চারণ করিসনি।

হীরু হাসিয়া উঠিল, বলিল, রাগ করিস কেন তুই? যাকগে, ও কথা না হয় ছেড়েই দে। কারণ, আমি যা বলছি সে তোর পছন্দ হচ্ছে না, আর তুই যা বলছিস, সে আমার পছন্দ হচ্ছে না। এখন আমার সঙ্গে যাবার কথা কি বলছিস, বল?

কি বলিব, সম্মতি দিয়াই বলিলাম, বেশ, যাব, চল!

কালই। কালই আমি যাচ্ছি।

কয়েকটি জরুরী কাজ ছিল। বলিলাম, কাল তো আমি যেতে পারি না হীরু। আমার যে কাজ রয়েছে।

সে হাসিয়া বলিল, কাজ তুলে রাখবার শিকে এখনও তৈরী করতে পারিসনি রে? বেশ, আমি কাল যাই; তুই পরে আয়, কেমন?

বলিলাম, বেশ।

হীরু উঠিয়া বলিল, সঙ্গে যাবি এখন—পানীয়-বিশেষ পান করতে? আপত্তি আছে?

হাসিয়া বলিলাম, না, আপত্তি নেই; কিন্তু অবসর হবে না আজ।

দিন সাতেক পর, হাঁ, সাত দিন পরই হীরুর নিমন্ত্রণে দেশে গিয়াছিলাম। স্টেশনে হীরুর মোটর ছিল। পরিচিত পারিপার্শ্বিকের মধ্য দিয়া বিপুল গতিতে যেন আমিই ছুটিয়া চলিয়াছিলাম। সে পারিপার্শ্বিক আজও এই অন্ধকারের মধ্যে হু-হু করিয়া পিছনের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে।

জাম ও সজিনার ঘনপল্লবছায়ান্বিত পল্লীপথ, জাম ও সজিনার নীচে ঘেঁটু ও ভাঁটি ফুলের জঙ্গল। রতনহাটি গ্রামখানা পার হইয়াই পদ্মফুলে ভরা শঙ্খপতির বিস্তৃত বিল, চারিপাশের ধারে ধারে তাহার কলমি পানাড়ি ও পদ্মদলের ঘের। কতকাল আগে নাকি এখানে কোন শঙ্খপতি নামে সওদাগরের বাস ছিল, এই ছিল নাকি তাহার বাণিজ্যতরী-বহরের বন্দর। ইহার পরই আসে রাণীপাড়া, গ্রামে ঢুকিতেই টোপরের মত বাগান-ঘেরা মোহান্তের আখড়া। আখড়ার ঈশান কোণের নারিকেল-কুলের গাছটি এখনও আছে কিনা কে জানে। আর সেই লাল কাঞ্চনের বাগানখানি! ইহার পরই আমাদের গ্রাম। প্রথমেই আসিল বাজিকরদের পাড়া। রহস্যময় যাযাবরদের ভাঙাচোরা ঘরগুলির চালের বাতায় ঝোলে সাপের হাঁড়ি; দুয়ারে প্রহরা দেয় বড় বড় কুকুর। এই গাজন ওই বাজিকরদেরই উৎসব!

ওই যে একটা বাজিকরের মেয়ে নৃত্য আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। বাজিকরপাড়া পার হইয়া গেল। এইবার একটা বাঁক ঘুরিলেই প্রথমে নজরে পড়িবে, গ্রামের প্রান্তে বাগান-ঘেরা

হীরুদের বাড়ির চিলেকোঠা। প্রকাণ্ড বড় বাড়িখানা চারিদিকে বহু মূল্যবান আম-কাঁঠালের বাগান দিয়া ঘেরা। কাঁচামিঠে আমের গাছগুলা আমাদের চিহ্নিত করা আছে। সুনিবিড় বৃক্ষপল্লবের আবরণের মধ্যে হীরুদের প্রাসাদতুল্য বাড়িখানার নীচের দিকে কিছু দেখা না, দেখা যায় শুধু বাগানের মাথার উপরে সাদা চিলে কোঠা, যেন আকাশের গায়ে একখণ্ড সাদা মেঘ। গাড়ি মোড় ফিরিল। এ কি! হীরুদের বাড়ি মাঠের মধ্যে বসাইয়া দিল কোন্ যাদুকর? বাগানের ঘের মুছিয়া দিল কে?

মনে আছে, হঠাৎ একটা মড় মড় শব্দে চকিত হইয়া প্রশ্ন করিয়া উঠিয়াছিলাম, এ কি, কিসের শব্দ?

ড্রাইভারটা বলিয়াছিল, বাগানের গাছগুলো কেটে ফেলা হচ্ছে।

কেন?

বাবুর হুকুম।

দৃষ্টি আমার নিবদ্ধ ছিল বাগানের দিকে। এ পাশের বাগানের চিহ্ন নাই, ও পাশের বাগানের গাছগুলির মাথা দুলিতেছে, যেন কাঁপিতেছে। মানুষের কুঠারাগ্রে বনস্পতির মৃত্যু শাণিত হাসি হাসিতেছে। সেই হাসির সংঘাতে যেন গাছ কাঁপিয়া মরিতেছে। মনে মনে বেদনা বোধ না করিয়া পারিলাম না। আজ চন্দ্রনাথকে মনে পড়িল, সে হইলে এমন কাজ করিতে পারিত না।

গাড়িখানা আসিয়া হীরুর দরজায় থামিল। হীরু সেখানে ছিল না, সে নিজে দাঁড়াইয়া গাছ কাটাইতেছে। সেখানে গেলাম।

সেই মুহূর্তেই একটা গাছ মরণার্তনাদ করিয়া মাটির বুকে আছাড় খাইয়া পড়িল।

হীরুকে বলিলাম, কি করলি? পূর্বপুরুষের হাতের তৈরী গাছগুলো কেটে ফেললি? এক হিসেবে ওরা তোর জ্ঞাতি।

মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া হীরু বলিল, মিথ্যে বলিস নি, জ্ঞাতির মতই ওরা আমার চারিদিকের আলো ও বায়ুর ভাগ নিয়ে ব'সে ছিল। ভাগ কেন, সমস্তই আত্মসাৎ ক'রে ফেলেছিল। বিনা উচ্ছেদে সূচ্যগ্র পরিমিত পথও ছেড়ে দিতে রাজি ছিল না। তাই উচ্ছেদই ক'রে ফেললাম।

তাহার কথায় আশ্চর্য হইলাম না, বলিলাম, ভাল। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, পৃথিবীতে এসে কটি গাছ সৃষ্টি করেছিস বল তো? এমন সুন্দরী পৃথিবীতে এসে তার রূপের পূজায় তুই কি দিলি?

সে হাসিয়া উত্তর দিল, রুদ্র-প্রিয়া সতী যখন দক্ষালয়ে যাচ্ছেন, তখন কুবের এসে রত্নালঙ্কারে তাঁকে সাজিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু নন্দীর সে পছন্দ হ'ল না। সে দেবীর অঙ্গ থেকে রত্নভূষা খুলে ফেলে তাঁকে সাজিয়ে দিলে বিল্বদল আর জবাফুলে, হাড়ের মালায়, রুদ্রাক্ষের কঙ্কণবলয়ে। পট্টবাসের পরিবর্তে গৈরিক-বসনে সে তাঁকে সাজিয়ে দিলে ভৈরবী। রুচিভেদ নিয়ে বিরোধ করিস নি ভাই, ও শুচিবাইয়ের মত নিতান্ত একটা মানসিক ব্যাধি।

আমি আর প্রতিবাদ করিলাম না। হীরু ইঙ্গিতে আমার ও তাহার মধ্যে একটা অধিকারের গণ্ডিরেখা টানিয়া দিল। সে গণ্ডিরেখার ওপারে পদার্পণ করিলে আমার নিজের অপমানই আমি করিব।

নীরবে হীরুর পাশে দাঁড়াইয়া রহিলাম। গাছের পর গাছ কাটা হইতেছিল। আজও এই ঘরের মধ্যে অন্ধকার যেন আলোড়িত হইতেছে। মনে হইতেছে, গাঢ় রঙের পল্লবঘন গাছগুলা

কাঁপিতেছে।

বিপুল ধ্বনিতে ছায়াপট মুখর হইয়া উঠিল যে। গাজনের ঢাক বাজিতেছে। ভক্তের দল আসিয়া হীরুর বাগানে প্রবেশ করিল। সিন্দূরলিপ্ত 'বাণ গোঁসাই' কাঁধে করিয়া বাজিকর-জাতির ভক্তদল ধ্বনি দিয়া উঠিল, ব—লো—শি—বো—হর—হর—বোম—হর—হর—বোম! আমি মুগ্ধ হইয়া দেখিতেছিলাম বাজিকরদের। এই জাতিটি আমার চিরদিনের বিস্ময়। যাযাবর জাতি, ভাঙাচোরা ঘরগুলি পিছনে ফেলিয়া বৈশাখেই দেশ-দেশান্তরে চলিয়া যাইবে, বর্ষায় ভাঙা ঘর ভূমিসাৎ হইবে, আবার ফিরিয়া নতুন ঘর তুলিবে। সে ঘরও আবার ভাঙে, আবার উহারা আসিয়া নতুন গড়ে। এই শিব, এই গাজন ওই বাজিকরদেরই নিজস্ব।

পুরুষে দেখায় ভেল্কিবাজি, নারীরা সাপ বাঁদর লইয়া নাচায়, নিজেরাও নাচে—নাগিনী-নৃত্য। অপূর্ব সে নৃত্য—স্থির চরণে দেহ হিল্লোলিত করিয়া, সে নৃত্যের নাম নাগিনীনৃত্য ছাড়া আর কিছু হইতে পারে না।

ব—লো—শি—বো—হর—হর—বোম—হর—হর—বোম!

চিন্তায় বাধা পড়িয়াছিল, ভক্তদল 'বাণ গোঁসাই' কাঁধে বাহির হইয়া গেল।

ঢাকের মাথায় পালকের ভূষা ও চামর দুলিয়া নাচিতেছিল। ভক্তদলের নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে বুকের উপর নাচিতেছিল ফুলের মালা।

কিন্তু প্রধান ভক্তের গলায় আছে হাড়ের মালা। সে আছে মন্দিরদুয়ারে নন্দীর মত।

এ কয়দিন তাহার মন্দিরদ্বার ত্যাগ করিবার উপায় নাই।

সন্ধ্যায় ছিল বহ্নুৎসব। বারুদের আতস-বাজি পুড়িতেছিল। অপব্যয়ের বিলাস হইলেও বেশ লাগিল। পৃথিবীর মানুষ যেন গ্রহ-গ্রহান্তরের অধিবাসীদের উদ্দেশে আলোকের বার্তা প্রেরণ করিতেছে। হাউইগুলো ঊর্ধ্বলোকে শব্দ করিয়া ফাটিয়া লাল নীল সবুজ নানা বর্ণের আলোকবিন্দুতে বিভক্ত হইয়া ঝরিয়া পড়িতেছে, যেন কল্পবৃক্ষের ফুল ঝরিতেছে। দূরে বোম-বাজি বিপুল শব্দে ফাটিতেছে। ফানুস উড়িয়া চলিয়াছে চলন্ত তারার মত।

বেশ মনে আছে, ভাবিতেছিলাম, বিচিত্র মানুষের অকারণ প্রমোদাভিলাষ! আনন্দ-ভিখারী মানুষ আগুনের মধ্যেও ফুল ফুটাইতে চায়। সাপ লইয়া খেলা করে সে, বাঘ লইয়া বাজি দেখায়।

ধ্বংস করিতে পারে যে শক্তি, তাহাকে আয়ত্ত করার অভিলাষের মূলে কি মানুষের মৃত্যুজয়ের অভিলাষ, না, মৃত্যু লইয়া বিলাস? জয়ের অভিলাষ ও বিলাসে প্রভেদ আছে, যাহাকে মানুষ ভয় করে তাহাকেই করিতে চায় সে জয়, সেখানে আছে দ্বন্দ্ব। কিন্তু বিলাস যে কামনাময় অনুরাগ ভিন্ন হয় না, বিলাসের যে বস্তু বা পাত্র তাহার প্রতি উন্মত্ত লালসা থাকা চাই।

হীরু আমার পাশে দাঁড়াইয়া আগুনের খেলা দেখিতেছিল, তাহার মুখে কথা ছিল না, সিগারেট টানিতেছিল শুধু।

অকস্মাৎ দূরে একটা টিলার উপর সাঁওতাল-পল্লীতে আকাশের আগুন নামিয়া আসিয়া শতমুখী হইয়া জ্বলিয়া উঠিল। আতস-বাজির আগুন লাগিয়া পল্লীটা জ্বলিয়া উঠিল। নরনারীর আর্ত কোলাহলে রাত্রির অন্ধকার ভয়ানক হইয়া পড়িল।

জল জল জল!

হীরুর হাত ধরিয়া আকর্ষণ করিয়া ছুটিয়া নামিয়া গেলাম। চৈত্র শেষের রৌদ্রে শুষ্ক

চালাঘর দাউ দাউ করিয়া পুড়িতেছিল। গরু বাছুর কলরব করিয়া ছুটিয়া পলাইতেছে। মুর্গীগুলা প্রাণভয়ে চীৎকার করিয়া জ্ঞানশূন্যের মত উড়িতেছিল। এঃ, একটা মুর্গী শিখার উপর দিয়া যাইতে যাইতে নাগিনীর বিষ-নিশ্বাসে আকৃষ্ট পঙ্গুর মত আগুনেই পুড়িয়া গেল।

জল জল জল!

আগুন ধীরে ধীরে কমিয়া আসিতেছিল।

হীরুকে খুঁজিলাম, পাইলাম না, সে বোধ হয় আসে নাই। ফিরিবার সময় ভাবিলাম, এইখানেই আগুনে মানুষে দ্বন্দ্ব, এইখানে আছে তাহার জয়ের অভিলাষ। আর ওই যে আতস-বাজির খেলা, ওখানে ছিল বিলাস-কামনা।

যে শক্তির মধ্যে মৃত্যুর প্রত্যক্ষ বসতি, তাহাকে লইয়া বিলাসের ফল আজ ফলিয়া গেল। অথবা হয়তো এ হীরুরই স্পর্শদোষ। জীবনের রাজ্যে সে অস্পৃশ্য—এ ধারণা আমার বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে।

হীরুকে তিরস্কার করিবার জন্য তাহারই সন্ধানে চলিলাম।

বাড়ি সে ছিল না। শুনিলাম মেলার দিকে গিয়াছে সে, কাহাকেও সঙ্গে লয় নাই, একাই গিয়াছে।

মেলার দিকে চলিলাম।

আমাদের দেশের চিরাচরিত যে ধারায় মেলা হইয়া থাকে, সেই ধারায় মেলা। কোথাও এতটুকু সংস্কারের চিহ্ন নাই। উগ্র তীব্র আলোকপ্রদীপ্ত পথে প্রমত্ত আনন্দ-সন্ধানী মানুষের ভিড়ের মধ্যে মিশিয়া গেলাম। কলরব-কোলাহলে, উচ্ছল হাসির উচ্ছ্বাসে মনের সুষুপ্ত বর্বর গর্জন করিয়া হিংস্র পশুর মত জাগিয়া উঠে। সিগারেট বিড়ি মদ ও খারাপ ঘি আর তেলের গন্ধ মিশিয়া সমগ্র বায়ুমণ্ডল দূষিত হইয়া উঠিয়াছে।

বহুকষ্টে হীরুকে খুঁজিয়া বাহির করিলাম। তখন গভীর রাত্রি, লোকজনের ভিড় কমিয়া আসিয়াছে। জুয়ার আড্ডায় তাহাকে পাইলাম। তাহার কোলের কাছে নোট ও টাকার রাশি।

তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া পরিস্ফুট ঘৃণার সহিত বলিলাম, জুয়ো খেলছিস তুই?

সে হাসিয়া বলিল, হ্যাঁ।

বোধ হয় তিরস্কারের ভাষা খুঁজিতেছিলাম।

হীরু বলিল, চল, মন্দিরে যাই। ফুলখেলার সময় বোধ হয় হয়ে এল।

ফুলখেলার নামে শরীর আমার রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। সমস্ত ভুলিয়া গেলাম। হীরুর আকর্ষণে নয়, বাল্যকালের ফুলখেলার স্মৃতির আকর্ষণে নির্বাক হইয়া হীরুর সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম।

বর্ষ-শেষের রাত্রিতে গাজনের ভক্তের দল নাচিতেছিল। বোলান গান হইতেছে, বৃত্তাকারের নৃত্যরত ভক্তদলের মধ্যে নরকপালের স্তূপ; নাচিতে নাচিতে তাহারা নরকপাল লইয়া খেলিতে আরম্ভ করিল। কেহ নরকপাল শূন্যে ছুঁড়িয়া দেয়, অন্য একজন লুফিয়া লয়। অন্য একজনে ছুঁড়িয়া দেয়, অপরে সেটা ধরে। শূন্যে নরকপাল যেন ভাসিয়া ভাসিয়া ফেরে, কেহ বা মাটির উপর শুইয়া পড়িয়া নরকপালের শূন্য মুখগহ্বরে মুখ দিয়া নিম্ন তীক্ষ্ণকণ্ঠে হাসিয়া উঠে।

ওদিকে ঢাক বাজিয়া উঠিল, এ খেলা থামিয়া গেল। এইবার হইবে ফুলখেলা, ভক্তদল শিবের মাথায় ফুল চড়াইবে।

ফুল, বৃক্ষজাত পুষ্পদল নয়, বহ্নিপুষ্পের অঞ্জলি। শিবমন্দিরের প্রবেশ দ্বারের সম্মুখে স্তূপীকৃত জলন্ত অঙ্গাররাশি উত্তাপে জ্যোতিতে নিশীথ অন্ধকারের বুকের মধ্যে ভয়াল মূর্তিতে জাগিয়া আছে। তাহার পশ্চাতে শ্রেণীবদ্ধ ভক্তদল।

ব—লো—শি—বো—শঙ্কর—হর—হর—বোম—হর—হর—বোম।

প্রধান ভক্ত দ্রুতপদে দুই করতল পূর্ণ করিয়া সেই বহ্নিপুষ্পের অঞ্জলি লইয়া ছুটিল মন্দির-পানে। শিবলিঙ্গের মস্তকে সে অঞ্জলি দিয়া আসিল। তারপর দলে দলে ভক্তদল ওই অঞ্জলি লইয়া—

হীরু! হীরু!

হীরুও ছুটিয়াছে ওই অঞ্জলি লইতে।

হীরু! হীরু!

আমিও তাহার পিছনে পিছনে ছুটিলাম।

দশ

হীরুকে একরূপ জোর করিয়া এই ভীষণ ভয়াবহ খেলা হইতে নিরস্ত করিলাম। এদিকে ভক্তের দল সেই স্তূপীকৃত জলন্ত অঙ্গাররাশির উপর ভক্ত-নৃত্য আরম্ভ করিয়া দিল। অদ্ভুত সে নৃত্য। বর্ষাবসানে বর্ষের শেষ রাত্রি, শেষ প্রহরের অন্ধকারের মধ্যে জলন্ত অঙ্গারের উপর ভক্তদলের সে নৃত্য যেন সমস্ত চেতনাকে মোহগ্রস্ত করিয়া তুলিতেছিল।

হীরু হাতজোড় করিয়া কাহাকে নমস্কার করিয়া বলিল, আয়।

দোতলার বারান্দায় বসিয়া বলিলাম, ঘুমিয়ে কাজ নেই, মৃত্যুর ওপর জীবনের জয়যাত্রা দেখব আজ। নববর্ষের সূর্যোদয় দেখব ব'সে ব'সে।

আমাকে একটা সিগারেট দিয়া হীরু নিজেও একটা ধরাইয়া বসিল। শেষরাত্রির তিমির তরল হইয়া আসিতেছে।

দূরে মেলাটা শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া যেন ঘুমঘোরে ঢুলিতেছে। অদূরেই কিসের একটা ক্ষুদ্র জনতা তখনও বিকৃত রসোল্লাসে কোলাহল করিতেছিল।

সহসা হীরু বলিল, চৈত্র-সংক্রান্তির শেষরাত্রি, বৎসরের এটা মৃত্যুলগ্ন! তার প্রভাব যে এড়াতে পারছি না নরু, চোখের পাতার ওপর তার অঙ্গুলি-স্পর্শে কেমন আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছি যে। তোর আপত্তি না থাকে তো বিষে বিষক্ষয় করি, নীলকণ্ঠ না হ'লে তো মৃত্যু জয় করা যায় না। বলিস তো বোতল গ্লাস নিয়ে আসি।

হাসিয়া ফেলিলাম, বলিলাম, আনবি আন, কিন্তু নীলকণ্ঠের দোহাইটা তুই মিথ্যেই দিলি। কণ্ঠে থাকিলে প্রতিবাদ করতাম না, কণ্ঠে তো থাকে না, সরাসরি যকৃতের ওপর গিয়ে প্রেমস্পর্শে তাকে পাকিয়ে তোলে যে!

উঠিয়া হীরু বলিল, উপায় কি? যকৃত যোগী হয়ে হন যকৃতানন্দ, দেহের মায়া-বন্ধন তখন তার ছিন্ন করবার প্রচেষ্টা যে স্বাভাবিক। বৈরাগ্য আসবে ভয়ে আধ্যাত্মিক আলোচনা করব না—এ তো হতে পারে না নরু।

সুরা তরল বহ্নির মত কণ্ঠনালীতে, শিরায় শিরায়, মস্তিষ্কে যেন আগুন জ্বালিয়া দেয়।

হীরু অদূরে জনতার দিকে চাহিয়া বলিল, ওটা কি হচ্ছে বল তো ?

বলিলাম, অন্যায় প্রশ্ন বন্ধু, দেহের অন্তরালে মন বরং আমরা দেখতে পাই, কিন্তু জনতার অন্তরালে কোন্ জন কোন্ অঘটন ঘটাচ্ছে, তা আমরা দেখতে পাই না।

হীরু ডাকিল, দারোয়ান ! .

দারোয়ানটা আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। হীরু বলিল, ওখানে কি হচ্ছে দেখ তো। নিয়ে এস এখানে, যা হচ্ছে।

অল্পক্ষণ পরেই দারোয়ানের পিছন পিছন আসিয়া দাঁড়াইল একটি মেয়ে। দেখিয়াই চিনিলাম, বাজিকরের মেয়ে—যাযাবরী।

হীরু আলোটা বাড়াইয়া দিল। পিঙ্গলবর্ণা তরুণী যাযাবরী, সুগঠিত দীঘল দেহ, পরনে পশ্চিমা মেয়েদের মত রঙিন ছিটের কাপড়, হাতে একহাত কাঁচের চুড়ি, গলায় বেলের খোলার একরাশ মালা—বেলফুলের কুঁড়ির মালার মত শুভ্র মহিমায় পিঙ্গলবর্ণ দেহের উপর যেন ঝলমল করিতেছে। তাহার কাঁকে একটা ঝুড়ি, ঈষৎ বঙ্কিম ভঙ্গিতে দাঁড়াইয়া সে হাসিয়া বলিল, গান শোনবা বাবু, নাচ দেখবা ?

মেয়েটার কণ্ঠস্বরের সুরে, ভাষার মিষ্টতায়, উচ্চারণের বিশিষ্ট একটি ভঙ্গিতে দেহে যেন রোমাঞ্চ দেখা দিল। অদ্ভুত মিষ্টভাষী এই যাযাবর জাতিটি। এমন মিষ্ট কথা আমি জীবনে কোন জাতির মুখে শুনি নাই। আর মোহময় একটা রহস্য যেন এই অনাবৃতদেহ জাতিটির সর্বাঙ্গ ঘেরিয়া মাখানো আছে। বর্বরা যাযাবরীরা মোহময়ী, সর্বাঙ্গে যেন মোহ জড়ানো। দীর্ঘ সবল দেহ, ক্ষিপ্র গতি, হাতে ভেল্কি, মুখে হরেকরকম বোল, কাঁধে ঢোল আর ঝুলি—যাযাবর রহস্যময় ! পূর্বে তাহারা নাকি আপন ছেলে কাটিয়া বাজি দেখাইত, আবার বাঁচাইত। আর একটা রহস্য—আজও এদের নারীর স্বাধীন জীবন, সে আপনাকে স্বেচ্ছায় বিলাইয়া দেয়, বাপ দাবি করে শুধু টাকা।

বিচিত্র যাযাবর জাতির ক্ষুদ্র একটি যূথ কেমন করিয়া কোন্ যুগে যে আমাদের এই গ্রামপ্রান্তে আসিয়া বাসা বাঁধিয়াছিল জানি না। বর্ষের প্রারম্ভে জাতিটা পথে বাহির হয়। একবার ফেরে দুর্গোৎসবের সময়। বাজিকরদের দুর্গোৎসব আছে। আর আসে গাজনের সময়। ওই শিবটি এই বাজিকরদেরই। তাহারা আসিয়া চৈত্র মাসের পনেরোই শিবকে জল হইতে তুলিয়া মন্দিরে স্থাপন করিবে, অন্য কাহারও শিব তুলিবার অধিকার নাই। গাজনের প্রধান ভক্ত ওই বাজিকরদেরই একজন। সে-ই রুদ্রদেবতার মাথায় প্রথম তুলিয়া দেয় বহ্নিপুষ্পের অঞ্জলি। আবার নববর্ষের প্রথম দিনে মহাকালকে জলের মধ্যে শীতল শয়নে শায়িত করিবে ওই বাজিকরেরাই। তারপর আবার উহারা বাহির হইয়া পড়িবে।

যাক।

হীরুর দিকে চাহিয়া দেখিলাম, সে সবিস্ময়ে যাযাবরীকে দেখিতেছে। আর সেই বন্য বর্বর মেয়েটাও অসীম বিস্ময়ে হীরুর দিকে চাহিয়া আছে।

হীরুকে বলিলাম, কি দেখছিস ?

সে উত্তর দিল, যাযাবরীর রূপ।

আমি হাসিলাম। হীরু সেটা লক্ষ্য করিল বোধ হয়। সে বলিল, অপরূপ নয়, কিন্তু রূপের মধ্যে উন্মাদনা আছে। ওর হাতে গলার বাহুবন্ধনে যদি কেউ পরিয়ে দেয় পদ্মবীজের মালা, তবে ওকে মৃত্যুর প্রতিবিম্ব ব'লে মনে হবে। মহাভারতের শান্তিপর্বে মৃত্যুর রূপের কথা মনে আছে তোর ?

যাযাবরী বলিয়া উঠিল, এত সোন্দর কি ক'রে তুমি হল্যা বাবু? এত সোন্দর রঙ তোমার?

আমি ঈষৎ রূঢ়তার সহিত বলিয়া উঠিলাম, নাচ দেখাবি গান করবি, তাই দেখা। এসব কথা—

সে খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। অদ্ভুত সে হাসি, দেহ যেন রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। সে হাসি তাহার আর শেষই হয় না।

আবার বলিলাম, হাসছিস কেন তুই?

সে আরও হাসিয়া উঠিল। এবার হাসিতে হাসিতেই বলিল, তুমার রাগ দেখে গো।

সবিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। সে আবার সেইরূপ হাসিতে হাসিতেই বলিল, উ বাবুটিকে দেখ্যা আমার ভাল লাগছে, তাই তুমার হিংসে হচ্ছে নাকি গো?

বর্বরা বলে কি! কিন্তু না হাসিয়াও পারিলাম না।

বলিলাম, দাঁড়া, তোদের মোড়লকে ব'লে দেব আমি।

সে বলিল, কি বলবা বাবু? ওই বাবুটি যদি আমার বাবাকে টাকা দিয়ে কিনে লেয় তো দিয়ে দিবে বাবা।

হীরু গ্লাস দুইটা ভর্তি করিয়া বলিল, কই, নাচ তুই।

যাযাবরী বলিয়া উঠিল, কি বটে বাবু, মদ নাকি? আমাকে টুকচা দিবে না? খেয়ে হরষ ক'রে নাচ দেখাই।—বলিয়াই সে আপনার ঝুড়ি হইতে একটা পাত্র বাহির করিয়া বসিল। উজ্জ্বল আলোকে ভ্রম হইবার নয়, দেখিলাম নরকপালের পানের পাত্র সেটা।

হীরু বলিল, ও পাত্রটা আমাকে দিবি?

সে মধুর কণ্ঠে বলিল, বালাই, মরণ হোক আমার, তুমার, ওই চাঁদপারা মুখে মড়ার খুলি তুলে দিব কি বল্যা গো!

হীরু পাত্রটার কানায় কানায় সুরায় পরিপূর্ণ করিয়া দিল। মেয়েটা নিঃশেষে সেটুকু পান করিয়া বলিল, উঃ! কিন্তু বড় মধুর জিনিস গো বাবু, বুকটা জলজ্বলিয়ে দিলেক গো।

হীরু নিজের গ্লাসটা তুলিয়া বলিল, মৃত্যু-প্রতিবিম্বময়ী ওই যাযাবরীর রূপশিখা পান করছি নরু। প্রার্থনা করি, তুইও তাই কর।

আমি বলিলাম, না, আমি কামনা করছি, ওই যাযাবরীর মোহে তোর যাযাবরত্বের অবসান হোক, ওই যাযাবরীর পদাঙ্কে পদাঙ্কে চরণপাত ক'রে গৃহে প্রবেশ করুন পুরলক্ষ্মী।

হীরুর উত্তর দিবার অবসর হইল না, তাহার পূর্বেই যাযাবরী গান ধরিয়া দিয়াছে। তাহাদের নিজস্ব গান, নিজস্ব সুর, নিজস্ব ভঙ্গি। বাংলার সঙ্গীতশাস্ত্রের মধ্যে সঙ্গীতে সে রূপ এখনও ধরা পড়ে নাই।

সে আরম্ভ করিল—

উ-র-র—জাগ—জাগ জাগিন ঘিনা—জারঘিনিনা।

সঙ্গে সঙ্গে দেহে যেন নৃত্য অপরূপ ভঙ্গিতে হিল্লোলিত হইয়া উঠিল। চরণ দুইটি তাহার স্থির, কিন্তু পদপ্রান্ত হইতে একটা বঙ্কিম হিল্লোল ক্রমশ দেহ বাহিয়া উঠিয়া আসিল।

সে গাহিতেছিল—

উ-র-র—পান চিরি চিরি—কথা কও ধীরি ধীরি—
প্রাণের কথা হায় কি বঁধু, উড়িয়ে দেবে আসমানে
হায় গো বল, কেমন ক'রে বাঁচব পরাণে।

উ-র-র—জাগ—জাগ—জাগিন ঘিনা—জারঘিনিনা।
উ-র-র—জাতি কি হীন বঁধু, জাতি কি হীন,
বঁধুর তরে পান সাজি রাত্রি ও দিন।
উ-র-র—সে পান আম্মার শ্যাম ছুঁলে না, মরি অভিমানে।
হায় গো বল, কেমন ক'রে বাঁচব পরাণে।
উ-র-র—জাগ—জাগ—জাগিন ঘিনা—জারঘিনিনা।
উ-র-র—এ বঁধু কুঞ্জবনে—খেলা করব দুজনে,
ডালিম ফুল বানায়ে ফাগে শ্যামকে রাখব যতনে।
উ-র-র—হায় রে কাপাল, ডালিম গাছের চিরুল চিরুল পাতা—
ফল তুলিতে ডাল ভাঙ্গিলাম, শ্যাম রইল কোথা!

সঙ্গে সঙ্গে নূপুরহীন স্তব্ধ চরণে তাহার দেহ বাহিয়া সেই তরঙ্গায়িত নৃত্য—যেন নাগিনীর নৃত্য। সুরার বহ্নিশিখা বুকের মধ্যে যে ভঙ্গিতে জ্বলিতেছিল, যাযাবরী যেন সেই ভঙ্গিতে নাচিয়া চলিয়াছে! সুরার আবেশে চক্ষু দুইটি তাহার অর্ধনিমীলিত বিহ্বল, রুক্ষ পিঙ্গল কেশপাশ তাহার শিথিল, এলোখোঁপা বুকে পিঠে ঝাপিয়া পড়িয়াছে। গান শেষ হইয়া গেল, তবু নৃত্য যেন ফুরায় না। আমরা বিস্ময়-বিহ্বল নেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া ছিলাম।

আজও অন্ধকারের মধ্যে আমার মনের ছায়াপটে যাযাবরী নাচিতেছে। ইচ্ছা হইতেছে ছায়াপটের এই অংশটুকু দীর্ঘ, সুদীর্ঘ জীবনব্যাপী দীর্ঘ হউক।

আজ এই মুহূর্তে মনে হইতেছে, যাযাবরী তাহার পিঙ্গল নয়নের দৃষ্টিতে সত্য দেখিয়াছিল। হীরুর রূপের প্রশংসা করায় আমার ঈর্ষাই জাগিতেছিল। যাযাবরী আমাকে মোহগ্রস্তই করিয়াছিল। কিন্তু অনুশোচনা হইতেছে না। জীবনরসে উচ্ছল যাযাবরী রহস্যময়ী।

হীরু অর্ধনিমীলিত নেত্রে যাযাবরীর নৃত্য দেখিতেছিল। যাযাবরীর নৃত্য শেষ হইল, সে শ্রান্তক্লান্তভাবে মাটির উপর যেন এলাইয়া পড়িল।

হীরু নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বলিল—

"সুরসভাতলে যবে নৃত্য কর পুলকে উল্লসি,
হে বিলোলহিল্লোল উর্বশী,
ছন্দে ছন্দে নাচি উঠে সিন্ধু-মাঝে তরঙ্গের দল,
শস্যশীর্ষে শিহরিয়া কাঁপি উঠে ধরার অঞ্চল,
তব স্তনহার হতে নভস্তলে খসি পড়ে তারা—
অকস্মাৎ পুরুষের বক্ষোমাঝে চিত্ত আত্মহারা,
নাচে রক্তধারা।"

সে যাযাবরীর স্তবগান করিল।

মেয়েটা হাঁপাইতেছিল। হীরু বলিল, নিয়ে আয় তোর পাত্রটা।

যাযাবরী যেন আনন্দে বিহ্বল হইয়া আসিয়া পাত্র সম্মুখে ধরিল। আমাদেরও পাত্র পরিপূর্ণ সুরায় টলমল করিতেছিল।

পাত্রটা শেষ করিয়া মেয়েটা যেন ঈষৎ সুস্থ হইল।

হীরু বলিল, বাড়ি যা এবার। কাল সকালে আসিস, বকশিশ নিয়ে যাস।

যাযাবরী বলিল, টুকচা বসি বাবু, তুমাকে দেখি। চোখের সার্থক ক'রে লিই গো চাঁদপারা বাবু।

হীরু আমাকে প্রশ্ন করিল, তোর কাছে টাকা আছে ? একটা দে তো।

টাকাটা লইয়া সে যাযাবরীর দিকে লক্ষ্য করিয়া ফেলিয়া দিয়া বলিল, এইবার যা।

মুহূর্তে যাযাবরী উঠিয়া চলিয়া গেল। টাকাটা পড়িয়া রহিল।

আমি বলিলাম, তাড়িয়ে দিলি ? অসীম প্রান্তরের মধ্যে অবাধে ছুটে চলে যে মন, সে মন তোর রূপসাগরে ডুবে মরছিল, তাকে অপমানের তরঙ্গাঘাতে কঠোর মাটির বুকে ফিরিয়ে দিলি ?

হীরু বলিল, তোর কাছে গোপন করব না নরু, আমারও মোহ জাগছিল, মায়াবিনীর মায়াতে যেন আপনাকে হারিয়ে ফেলছিলাম।

পূর্বদিগন্ত রাঙা হইয়া উঠিয়াছে, নববর্ষের সূর্যোদয় হইতেছিল।

প্রভাতেই হীরু বলিল, চল শিকারে যাই।

শিকারে গেলাম সেই শঙ্খপতির বিলে ; বিস্তৃত বিল, চারিপাশে উলুখড় ও কাশবনের গুল্মগুলি তখন সেই বৈশাখে পত্রকাণ্ডহীন, বিশুষ্ক। বিলের জলের কোলে কোলে পদ্মলতার কোমল কিশলয় দুই চারিটি করিয়া সবে দেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছে। বিলের জল নির্মল কাকচক্ষুর মত কালো, উপরের আকাশেরই মত নিষ্কম্প, স্থির। নানাজাতীয় জলচর পাখীর দল কলরব করিয়া ফিরিতেছিল। বিচিত্র বর্ণ, বিচিত্র কলস্বর ! মাথার উপর কত দল পাক দিয়া ঘুরিতেছে ! এক দল বসে, একদল উড়ে। চারিপাশে জল ও তীরভূমির সংযোগস্থলে দীর্ঘপদ শুভ্রপক্ষ বকগুলি মাছের প্রতীক্ষায় তপস্বীর মত স্থির হইয়া বসিয়া আছে।

হীরু বলিল, হংসবলাকার দল দেখেছি মানসের সন্ধানে যাত্রা করেছে। মরাল আর ডাহুক ছাড়া বড় কিছু নেই।

আমি বলিলাম, কিংবা হয়তো তারা পূর্ব হতেই ব্যাধের আগমনবার্তা পেয়েছে।

বাধা দিয়া হীরু বলিল, ভুল বন্ধু, ভুল। ব্যাধিনী সংসারে এক, সে হ'ল মহাকালের প্রেয়সী মৃত্যু, তার বার্তা তো পাবার নয়, পায়ও না কেউ। অহরহ সে তো পশ্চাতে পশ্চাতে রয়েছে, যে কোন দিন, যে কোন মুহূর্তে, যে কোন শস্ত্রে জীবনকে শিকার সে করতে পারে। আমরা হলাম মাংসলোভী বাজপাখী, কি সারমেয়ের দল, জীবন নিলে তবে আমরা পাই তার শবদেহ।

অদ্ভুত দর্শনতত্ত্বের ব্যাখ্যায় হাসিয়া ফেলিলাম, বলিলাম থাক তত্ত্বকথা এখন।

হীরু তীক্ষ্নদৃষ্টিতে চাহিয়া চাহিয়া দেখিয়া বলিল, চল, ওপাশের তীরে যেতে হবে।

আঁকা-বাঁকা তীরভূমির ঘাসের উপর সন্তর্পিত পদক্ষেপে যথাসম্ভব আত্মগোপন করিয়া চলিয়াছিলাম। কাশ ও উলু বনের ধারালো শুকনা পাতায় পায়ের স্থানে স্থানে কাটিয়া জ্বালা করিতেছিল ; আমার কিন্তু জ্বালার অপেক্ষা কৌতুক অধিক পরিমাণে জাগিয়া উঠিল। বলিলাম, উদরের জ্বালা পায়ে অনুভব করছিস হীরু ?

হীরু মৃদুস্বরে বলিল, সৃষ্টির প্রারম্ভে সমুদ্রমন্থনে উঠল যে সুধা, সে আত্মসাৎ করলে দেবতা, তারপর উঠল গরল, সে পান করলেন নীলকণ্ঠ, মানুষের ভাগ্যে পড়ল বিক্ষুব্ধ বারিধির শূন্য উদরের বিক্ষোভ, সেই হ'ল ক্ষুধা। ক্ষুধার তাড়নায় পৃথিবী অস্থির। উপায় কি ? উদরের ক্ষুধা, দেহের ক্ষুধা, মনের ক্ষুধা—উঃ, গন্ধ কিসের উঠছে, বল তো ?

সত্যই একটা দুর্গন্ধ—যেন দগ্ধ দেহের গন্ধ নাকে আসিয়া প্রবেশ করিতেছিল।

হীরু বলিল, ওখানে ঝোপের মধ্যে কে ?

অগ্রসর হইয়া দেখিলাম, দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলাম। একটা লোক অর্ধদগ্ধ কোন

পশুশিশুর দেহ টানিয়া টানিয়া ছিঁড়িয়া খাইতেছে। নিতান্ত পশুর দেহ। লোকটাকেও চিনিলাম, পেশাদার চোর ছিল একদিন, এখন দুইটি পা-ই তাহার ভাঙিয়া গিয়াছে। চুরি করিতে গিয়াই উচ্চ প্রাচীর হইতে পড়িয়া পা দুইটি হারাইয়া হতভাগ্য এখন চীৎকার করিয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। কিন্তু পঙ্গু নয়, ওই হাতের উপরে ভর দিয়াই ক্রোশের পর ক্রোশ সে ঘুরিয়া আসে। শুধু শিহরিয়াই উঠি নাই, লালসার কদর্য রূপ দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াও গিয়াছিলাম সেদিন। আজও এই অন্ধকারের মধ্যে অনুভব করিতেছি, সমগ্র দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে। লোকটা ধরা পড়িয়া বিহ্বলের মত মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। হীরু বলিল; ওটা কি ?

লোকটা মিথ্যা বলিতে পারিল না, বলিল, ছাগলের ছানা।

নির্বাক বিস্ময়ে আমরা তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। লোকটা ভীত অনুনয়ের সহিত বলিল, অনেক দিন মাংস খাই নাই বাবু—

হীরু বলিল, কিন্তু তুই ধরলি কেমন ক'রে ওটাকে ?

আজ্ঞে, এইখানে ছানাটা একলা চীৎকার করছিল, তাই চুপিচুপি এসে—

সে বুঝেছি, কিন্তু ধরলি কেমন ক'রে খোঁড়া পায়ে ?

সে বলিল, এতেই আমি দৌড়ে যাওয়ার মত জোরে যেতে পারি বাবু। অভ্যেস হয়ে গিয়েছে।

তাহাকে তিরস্কার করিতে পারিলাম না, ঘৃণা করিতেও পারিলাম না। নীরবেই তাহাকে অতিক্রম করিয়া দুইজনে চলিয়া গেলাম। খানিকটা অগ্রসর হইয়া পিছন ফিরিয়া দেখিলাম, খঞ্জ দ্রুতবেগে হাতের উপর ভর দিয়া পলাইয়া যাইতেছে। অনুমান করিলাম, অর্ধদগ্ধ পশুদেহটাও সে নিশ্চয়ই ফেলিয়া যায় নাই, হয়তো কুকুরের মতই মুখে ধরিয়া লইয়া যাইতেছে।

বেশ মনে আছে, আমি নতশিরে হীরুকে অনুসরণ করিয়া চলিয়াছিলাম। অকস্মাৎ চমকিয়া উঠিলাম বন্দুকের শব্দে। দেখিলাম হীরুর বন্দুকের ঊর্ধ্বমুখ নলের প্রান্তে ক্ষীণ ধোঁয়ার রেশ। আকাশের বুকে সঞ্চরমাণ একঝাঁক মরালের মধ্য হইতে গোটা কয়েক শিথিলপক্ষ নিম্নমুখ হইয়া ধরিত্রীর বুকে ঝরা পাতার মত নামিয়া আসিতেছে। হীরু আবার টোটা পুরিতেছিল। সে আমাকে বলিল, ফায়ার কর, ফায়ার কর।

মুহূর্তে ভুলিয়া গেলাম খঞ্জের মধ্যে লালসার সেই ভয়ঙ্কর রূপ। বন্দুকটা উঁচু করিয়া ধরিয়া পলায়নপর বিহঙ্গমদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ঘোড়া টিপিলাম।

হীরু আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিল, বিউটিফুল! সুন্দর! সুন্দর!

উত্তেজনায় আনন্দে রক্তে যেন জোয়ার ধরিয়া গেল। হত্যায় যে এমন উন্মত্ত আনন্দ সে আমি জানিতাম না। ইচ্ছা হইতেছিল, গুলির পর গুলি চালাইয়া বিলের সমস্ত পাখীর দল উজাড় করিয়া দেই। উপরে মরণ-ভীত বিহঙ্গমের দল ক্রমশ ঊর্ধ্বে উঠিতেছিল, বিলের জলে যাহারা খেলা করিতেছিল, তাহারাও বিপরীত মুখে ভয়ার্ত কলরব করিতে করিতে উড়িয়া গেল।

হীরু আমার চেতন আনিয়া দিল, কহিল, তারপর ?

প্রশ্ন করিলাম, কি ?

হীরু বলিল, কিছু না, চল। পাখীগুলো জলের ওপর পড়েছে। তা যাক, মা ফলেষু কদাচন—শাস্ত্র বাক্যটা স্মরণ করতে করতে চ'লে যাই।

মন কিন্তু আমারই মানিল না, জীবনে হত্যাকাণ্ডের প্রথম পুরস্কার এই শবদেহগুলি ছাড়িয়া

যাইতে কিছুতেই ইচ্ছা হইল না। ভাবিলাম আমিই বিলের জলে ঝাঁপ দিয়া পড়ি।

আকাশ থেকে ফুল পাড়ল্যা গো বাবু, ফুল পড়ল জলে? হায় হায় হায়!

পিছন ফিরিয়া দেখি, সেই বাজিকরদের মেয়েটা পিছনে দাঁড়াইয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছে। দিনের আলোকে হীরু তাহাকে প্রখর দৃষ্টিতে দেখিতেছিল। আমি বলিলাম, আরে মর, তুই কোথেকে এলি?

সর্বাঙ্গে একটি হিল্লোলের সঞ্চার করিয়া সে বলিল, বিলের কূলে সাপ ধরতে আইছিলাম গো বাবু, তুমাদের বন্দুকের রজ শুনে এলম, তা হায় হায় বাবু, শেষে জলে পড়ল গো? তুল্যে দিব আমি?

আমি বলিলাম, পারবি তুই?

সে হাসিয়া বলিল, ওই চাঁদপারা বাবুটি যদি ব'লে, তবে আমি পারি, লইলে লারব।

হীরু এবার প্রশ্ন করিল, পারবি তুই?

যাযাবরী বলিল, মরি তোমার লেগ্যে মরব। তুমি টুকচা কাঁদবা আমার লেগ্যে?

বলিয়া সে কাঁকালের ঝুড়ি নামাইয়া কাপড়ের আঁচলে গাছ-কোমর বাঁধিয়া জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িল। ঝুড়িটার মধ্যে সাপের ঝাঁপিতে সাপ গর্জন করিতেছিল। ঝুড়ির দিকেই চাহিয়াছিলাম। অকস্মাৎ বিলের বুকে মেয়েটা চীৎকার করিয়া উঠিল, ডুবলুম গো।

চমকিয়া উঠিলাম, মেয়েটা জলে ডুবিতেছে। হীরু তখন ঝাঁপ দিয়া পড়িয়াছে। আমিও কাপড় সাঁটিয়া নামিবার উদ্যোগ করিলাম; কিন্তু নামা হইল না। দেখিলাম, যাযাবরী স্বচ্ছন্দে জলের উপর ভাসিয়া খিলখিল করিয়া হাসিতেছে।

হীরু ফিরিয়া আসিয়া সিক্ত-দেহে তীরে বসিয়া যাযাবরীর জলখেলা দেখিতে বসিল। বুকে হাঁপাল দিয়া জলে তরঙ্গ তুলিয়া পায়ের আঘাতে বিলের জল ফোয়ারার ধারার মত চারিদিকে ছড়াইতে ছড়াইতে সে চলিয়াছিল।

আমি বলিলাম, অদ্ভুত জাত! কেমন ক'রে ওরা এখানে এল, তুই কিছু জানিস?

হীরু কোন উত্তর দিল না।

আমি আবার বলিলাম, বোধ হয় তোদের পুরানো খাতাপত্র থেকে পাওয়া যেতে পারে।

যাযাবরী উঠিয়া আসিয়া পাখীগুলি সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া বলিল, এই লাও গো বাবু, কি বকশিশ দিব্যা দাও। কেমন রাঙাপারা হাত পেত্যেছি দেখ।

বলিয়া সে হাসিতে হাসিতে জলসিক্ত কেশভার এলাইয়া জল নিঙড়াইয়া ফেলিতে আরম্ভ করিল।

হীরু উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, কি বকশিশ চাস, বল?

কৌতুকময়ী মেয়েটা বলিল, টুকচা ব'স তুমি বাবু, সাপের খেলা দেখ, তবে তো বকশিশ দিব্যে।

হাঁ-হাঁ করিয়া উঠিয়া বলিলাম, আরে, বিষ গেলেছিস ওর?

বাঁ হাতে ছোট একটা লাঠি লইয়া সে তখন ঝাঁপি খুলিয়া দিয়া গান ধরিয়াছে—

মাথায় পশরা লয়্যা—গোয়ালিনী হাঁকে পথে
দধি—লে—ওগো—তুরা দধি—লে!

আমি বলিলাম, ওরে তুই সাপ বন্ধ কর বাপু, বিষদাঁত এখনও ভাঙিস নি।

গান শেষ করিয়া অবলীলাক্রমে উদ্যতফণা বিষধরকে ধরিয়া সে বলিল, মন্তর আছে গো বাবু জড়ি আছে। এই দেখ কেনে!

ঝাঁপিতে সাপ বন্ধ করিয়া যাযাবরী বলিল, আমাকে ওই বন্দুক ছুঁড়তে দিব্যা বাবু একবার? পরাণে বড় সাধ হয় গো।

হীরু তৎক্ষণাৎ বন্দুকটা তাহার হাতে তুলিয়া দিয়া বলিল, নে, তোর স্পর্শে মারণাস্ত্র আমার ধন্য হোক। তোর নাম দিলাম আমি চিত্রাঙ্গদা।

বড় বড় পিঙ্গল চোখ দুইটি তুলিয়া সে বলিল, কি নাম দিল্যা?

হীরু বলিল, চিত্রাঙ্গদা। সে এক রাজার মেয়ে, কিন্তু তোরই মত বনে বনে দুর্দান্ত সাহসে ঘুরে বেড়াত।

সে একবার খিলখিল করিয়া হাসিয়া বলিল, বড়া মিঠ্যা নাম গো বাবু, কিন্তুক আমার নাম যে মুক্তকেশী।

হীরু বলিল, তা হোক, আমি তোকে চিত্রাঙ্গদা ডাকব। আয়, এইবার তোকে বন্দুক ছুঁড়তে শিখিয়ে দিই।

যাযাবরীর হাতে হাত ধরিয়া কপোলে কপোল স্পর্শ করিয়া হীরু লক্ষ্য স্থির করিবার পদ্ধতি বুঝাইয়া দিয়া বলিল, নে, এইবার আঙুল দিয়ে টান এই ঘোড়াটা, দেখবি, ওই বকটা পড়বে।

সে বলিল, তুমি ছেড়ে দাও, তবে তো মারি।

না, তোর ভুল হবে।

না গো বাবু, না; মন ভুল হল্যেই ভুল হব্যে। চোখেও তখন ভুল দেখব যে।

আমি হাসিয়া বলিলাম, মন ভুল হবে কেন রে?

বন্দুক ছাড়িয়া দিয়া সে বলিল, ওই চাঁদপারা বাবুটির কাছে মন আমার ভুল হচ্ছ্যে গো বাবু। দেখ, তুমি যেন আবার রাগ ক'র না। হেই দেখ, আমাদের গোটা জাতটা মন হারায়্যা হেথায় ঘর বাঁধলে।

কৌতূহলী হইয়া বলিলাম, বল তো কি শুনি?

সে বলিল, এই দেখ, অ্যানেক দিন আগে—সি আমরা জানি না কত দিন—তখন আমরা ছিল্যাম হাঘর্যা, পথে পথে ঘুরতাম। একদিন হেথাকে এসে দল লিলেক বাসা। আধার রাত, দুবার শ্যাল ডেক্যে গেল। তখন দুটি বুড়া বুড়ী এসে মোড়লকে ডেকে বললে, দেখ বাপু, এই আমরা হলাম শিব আর দুগ্গা। আমাদের এই গাঁয়ে তুমাদের পূজা করতে হবে। মোড়ল বললে, তা কি কর্যে হবে বাবা, আমরা হলাম হাঘর্যা, ঘর আমাদের বাঁধতে নাই যে। শিব দুগ্গাও ছাড়ে না, মোড়লও রাজি হয় না। তখন শিব দুগ্গা চলে গেল। চ'লে গেল না, কাছেই লুকিয়ে রইল। তারপর যখন রাতের শেষ পহর সবাই যখন ঘুমিয়েছে তখন শিব দুগ্গা এস্যে আমাদের মন চুরি ক'রে নিয়ে হেথাকার মাটির তলায় পুঁতে দিলে। তাথেই আমরা দুগ্গা-পূজো আর শিব-পূজো করি গো বাবু।

সে নীরব হইল। হীরু অস্থির হইয়া বলিল, যাক তোর মন-চুরি। বন্দুক ছুঁড়বি আয়।

আবার তেমনই হীরুর বাহু-বন্ধনের মধ্যে দাঁড়াইয়া যাযাবরী লক্ষ্য স্থির করিল।

হীরু বলিল, টান ঘোড়া।

মুহূর্তে অগ্ন্যুদ্গার করিয়া বন্দুকটা গর্জন করিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে কয়টা বক অত্যন্ত আর্তভাবে ঝটপট করিয়া জলে পড়িয়া গেল।

বন্দুকটা হীরুর হাতে ছাড়িয়া যাযাবরী আনন্দে করতালি দিয়া আবার জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

এগারো

মধ্যাহ্নে বিশ্রামের পর উঠিয়া হীরুকে দেখিতে পাইলাম না। বিশেষ সন্ধানও করিলাম না। অবকাশ পাইয়া বউদিদিকে দেখিতে চলিলাম। শিবের তপস্যা ভঙ্গ করিয়াছিলেন গৌরী; শুধু তপোভঙ্গ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, অন্নপূর্ণারূপিণী হইয়া মহাকালকে আপন দুয়ারে ভিক্ষুক করিয়া ছাড়িয়াছিলেন। বউদিদিকে আজ এই বলিয়া রহস্য করিব স্থির করিলাম।

দরজার প্রবেশ-মুখেই বলিয়া উঠিলাম, জয় হোক গো অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণী, আপনার জয় হোক।

বিরক্তিপূর্ণ নীরস কণ্ঠস্বরে জবাব আসিল, কে রে মুখপোড়া ভিখিরী, আমায় ঠাট্টা করতে এসেছ?

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বউদিদি ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন।

হাসিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিলাম, মুখপোড়াই বটে বউদিদি, তবে লেজ নেই।

সবিস্ময়ে তিনি বলিলেন, কে, নরু ঠাকুরপো। ওমা, কোথা যাব আমি! কি বললাম! ছি ছি! ব'স ব'স।

বসব বইকি। কিন্তু আপনাকে অন্নপূর্ণা সম্বোধনটা তো ঠাট্টা নয়, ওটা যে সত্যি। জানেন তো, গৌরী মহাযোগীর তপোভঙ্গ ক'রে তাকে ভিক্ষুক সাজিয়ে নাম নিয়েছিলেন অন্নপূর্ণা। তাই তো অনেক হিসেব ক'রে আপনার নামটা ঠিক করেছি। আপনার ভিক্ষুকটি কই— আমার দাদা? এ কি বউদি, কি হ'ল?

বউদিদি যেন বিবর্ণ পাংশু হইয়া গেলেন, চোখের কোল ভরিয়া জল ছলছল করিয়া উঠিল।

শঙ্কিত হইয়া আবার প্রশ্ন করিলাম, কি হ'ল বউদি?

আঁচল টানিয়া চোখের জল মুছিয়া অল্প একটু হাসিয়া বউদিদি বলিলেন, হয়নি কিছু। কিন্তু সেই কথাটা তুমি আজও মনে রেখেছ?

সে আমি কখনও ভুলব না বউদি; চিরদিন মনে থাকবে।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বউদিদি বলিলেন, কথাটা ভুলেই যেও ভাই, আমার অহঙ্কার ভেঙে গেছে।

চমকিয়া উঠিয়া বলিলাম, ভেঙে গেছে! সে কি, তা হ'লে দাদা কি—? প্রশ্ন শেষ করিতে পারিলাম না।

বউদিদি বলিলেন, হ্যাঁ, আবার তাই। লজ্জার কথা ঠাকুরপো, কিন্তু তুমি আমার ভাইয়ের অধিক, তোমার কাছে আমার লজ্জা নেই, আমাকে স্পর্শ পর্যন্ত করেন না। হাতে হাতে জিনিস পর্যন্ত নেন না।

নীরবে মাটির দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিলাম, বউদিদির মুখের দিকে চাহিতে আমার লজ্জা হইতেছিল।

বউদিদি হাসিয়া বলিলেন, একটু জল খাও ঠাকুরপো. এত বড় নামটা যখন দিলে তুমি, তখন আমার মানটা রাখ।

হাত দুইখানি পাতিয়া ভিক্ষুকের মত বলিলাম, দিন, সত্যিই ক্ষিদে পেয়েছে।

তিনি বলিলেন, হাত নামাও তা হ'লে, অন্নপূর্ণার দান ওইটুকু হাতে কি ধরে? থালা

ভ'রে মুড়ি দোব।

মুড়ি বাহির করিয়া তিনি নামাইয়া দিয়া বলিলেন, এখুনই খেতে আরম্ভ ক'র না যেন, আমি ওদের বাড়ি থেকে একটু তেল আর আদা নিয়ে আসি।

তিনি বাহির হইয়া গেলেন। আমি ভাবিলাম, পলাইয়া যাই। কিন্তু পারিলাম না, তাহাতে আমার লজ্জার চেয়ে বউদিদির লজ্জাই হইবে অধিক। কিন্তু নিশানাথবাবুর জীবনের এ কি দুর্বার আকাঙ্ক্ষা! স্নেহের সিঞ্চনে নিভে না প্রেমের অমৃতধারা, শীতল হয় না যে কামনা-বহ্নি, সে কি তাঁহাকেই নিষ্কৃতি দিবে!

বউদিদি ফিরিয়া আসিয়া বসিয়া মুড়িতে তেল মাখিতে মাখিতে বলিলেন, বেশ বলেছ কিন্তু ঠাকুরপো!—অন্নপূর্ণা! সেই পড়েছিলাম, 'পিতামহ দিলা মোর অন্নপূর্ণা নাম, ভগবানে মতি দিয়ে পতি মোর বাম!' পথে আসতে শেষটুকু নিজেই পালটে দিলাম।

মুড়ি চিবাইতে চিবাইতে বলিলাম, আবার এ রকম হ'ল কতদিন?

ঠিক মাস ছয়েক পরেই। মাস ছয়েক বেশ ছিলেন। তার পরই হ'ল কি জান, অহরহ যেন চিন্তাই করছেন, চিন্তাই করছেন। আমি কিছু বললেই একেবারে রেগে আগুন! তারপর চৈত্র-সংক্রান্তিতে গেলেন গঙ্গাস্নানে। গঙ্গাস্নান ক'রে ফিরে এলেন, আমি তাড়াতাড়ি পা ধুতে জল দিলাম, পা ধুলেন। আমি গামছা দিতে গেলাম হাতে, অমনই হাতটা সরিয়ে নিয়ে বললেন, হুঁ হুঁ, ছুঁয়ো না। জিজ্ঞাসা করলাম, কেন? না—পঞ্চতপা করব সংকল্প করেছি, স্ত্রীলোক স্পর্শ নিষেধ। তারপর পঞ্চতপা হ'ল, সমস্ত দিন পাঁচ দিকে পাঁচটা হোম জ্বেলে তার মধ্যে ব'সে জপতপ। সন্ধ্যেবেলায় মানুষ উঠতে, যেন সেদ্ধ করা শাকগাছটা। তবু আমার ছোঁবার হুকুম নেই, যত্ন করবার অধিকার নেই। যাকগে ভাই, সে পঞ্চতপা শেষ হ'ল, কিন্তু আমায় আর ছোঁয়ার ইচ্ছে হ'ল না।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া প্রশ্ন করিলাম, কোথায় তিনি?

গুরুদর্শনে পদব্রজে গেছেন কাশী। আমার প্রহার দেখ, মেয়ে বড় হয়ে উঠেছে, ছেলের নাম কেটে দিয়েছে ইস্কুল থেকে মাইনের জন্যে। বলব কি ঠাকুরপো, এক এক দিন উপোস যাই। যাকগে, আমার দুঃখের কথা থাক, এখন তোমার কথা বল, বউ কেমন হ'ল?

বিয়ে করিনি বউদি।

ওমা সে কি?

আমি হাসিতে আরম্ভ করিলাম। বউদিদি আবার বলিলেন, না, সে বেশ করেছ ভাই, একটা অবলাকে কষ্ট দিয়ে আর কি ফল হ'ত! তুমিও তো শুনেছি লেখা-লেখা ক'রে মেতে আছ, চাকরি-বাকরিও কর না ওই জন্যে। তোমার হাতে সেও হয়তো এমনই কষ্ট পেত!

সেই তো, সেই জন্যেই বিয়ে করিনি। কই আপনার মেয়েকে ডাকুন, আমি তার জন্যে পাত্র খুঁজব বরং।

আমার মেয়েকে তুমি বিয়ে করবে নরু? মেয়ে আমার সুন্দরী, আর বড় ভাল মেয়ে।

বলিলাম, না বউদি, আমি তার জন্যে খুব ভাল পাত্র খুঁজে দোব।

আমার মুখের দিকে চাহিয়া বউদিদি বলিলেন, তুমি তো অনেক বই-টই লিখেছ, জ্ঞানী বিদ্বান্ মানুষ তোমরা, একটা কথার জবাব দিতে পার? স্ত্রীলোকই কি পাপের ঘর? তাদের মধ্যেই কি পাপ বাসা বেঁধে থাকে?

তাঁহার পায়ের ধুলা লইয়া বলিলাম, যাঁদের থেকে মানুষ এ দেহ পায় বউদি, তারা কি কখনও পাপের ঘর হতে পারে? তবে আপনারা হলেন মহামায়ার অংশ, আপনাদের মায়ায়

মানুষ আপনাকে ভুলে যায়।

তিনি বলিলেন, মিথ্যা কথা। তা হ'লে আমার দশা এমন হ'ত না। এই যে, এই আমার মেয়ে, ঠাকুরপো। নিরু, প্রণাম কর, কাকা তোমার। বই লিখেছেন অনেক, সেই যে সেদিন বলছিলি—নরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এই ইনি।

জলের কলসী কাঁখে লইয়া মেয়েটি সম্মুখে দাঁড়াইয়া ছিল। সত্যই সুন্দরী মেয়ে, তবে অপরূপ কিছু নয়, কিন্তু শান্ত স্নিগ্ধ মুখচ্ছবি দেখিয়া মনে হইল, শান্তি ইহার সর্বাঙ্গে। এ মেয়েকে যে বিবাহ করিবে, সে শান্তিবারিতে অভিসিঞ্চিত হইয়া জুড়াইয়া যাইবে। মনে মনে সংকল্প করিলাম, হীরুকে ধরিব। তাহার মনের গহনে স্নেহলতা রোপণ করিয়া তাহাকে ধন্য করিয়া দিব। কিন্তু নিতান্ত ছেলেমানুষ যে, এই তো কৈশোরের প্রারম্ভ! তবুও বলিব। উঠিয়া বলিলাম, আমি ভাল পাত্র দেখে দোব বউদি, ভাববেন না আপনি।

ফিরিয়া আসিয়াও হীরুকে পাইলাম না।

কেহ কোন সন্ধানও দিতে পারিল না।

সন্ধ্যায় দেখা হইল। সিঁড়ির মুখেই দেখিলাম, হীরু যাযাবরীকে সঙ্গে লইয়া উঠিয়া আসিতেছে। আমাকে দেখিবামাত্র বলিল, যাযাবরী আমায় জয় করলে নরু! ওর বাপকে যৌতুক দিয়ে চিত্রাঙ্গদাকে নিয়ে এলাম, মনের বনে রোপণ করলাম বন্য শ্যাম-লতা। এখন সমস্যা ওকে পুরপ্রবেশ করিয়ে বন্দিনী করি, না আমিই গৃহত্যাগ ক'রে মুক্তি নিই!

স্তম্ভিত হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিলাম। আমার মনের কথা মনেই থাক, সে কথা হীরুর কাছে উচ্চারণ করিলে স্নেহময়ী বউদিদির অপমানই আমি করিব।

ছায়াছবির এইখানেই শেষ। পরদিন আমি হীরুকে ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছিলাম। যাযাবরীর প্রেমোন্মত্ত হীরুর সহিত আসিবার সময় দেখাও করি নাই।

চিন্তায় ছেদ পড়িল। একটা সিগারেট ধরাইয়া বসিলাম।

বারো

তারপর, কই? মনে মনে জীবন-ইতিহাসের পাতা—পাতার পর পাতা—উল্টাইয়া চলিয়াছি। চন্দ্রনাথ, মীরা, হীরু কাহারও দেখা পাইতেছি না। দুই বৎসর পর, চন্দ্রনাথের সঙ্গে কানপুরে সেই সাক্ষাতের বোধ হয় চার বৎসর পর, আবার চন্দ্রনাথের সন্ধান পাইলাম।

অকস্মাৎ একখানা চিঠি পাইলাম ধানবাদের এক উকিলের নিকট হইতে।

ভদ্রলোক লিখিয়াছেন, "আপনার বন্ধু বাবু চন্দ্রনাথ সিংহ বিশেষ বিপদগ্রস্ত। আমি তাঁহার উকিল; যাঁহার সুপরামর্শ তিনি গ্রহণ করিতে পারেন, এমন বন্ধুর এখন তাঁহার বিশেষ প্রয়োজন। তাঁহার স্ত্রী আপনার নাম করিলেন। আপনি আসিলে হয়তো তিনি রক্ষা পাইতে পারেন। কোনরূপে যদি আসিতে পারেন, তবে বড়ই ভাল হয়।"

পরিপাটি ইংরেজীতে নিখুঁত কায়দায় চিঠিখানি লেখা।

অনেকক্ষণ চিন্তা করিলাম। ভাবিতেছিলাম, কি এমন বিপদ! কিন্তু বিপদ যাহাই হউক, সুপরামর্শ দিবার জন্য আমাকে প্রয়োজন। কিন্তু চন্দ্রনাথ কি কাহারও পরামর্শ গ্রহণ করিবে? কিছুতেই আশা করিতে পারিলাম না। তবুও রওনা হইলাম, মীরাকে মনে করিয়া না গিয়া

থাকিতে পারিলাম না।

মানভুম জেলার একটা স্টেশন, নাম কি মনে নাই। তবে ধানবাদের নিকটেই। কোথায় কানপুর, আর কোথায় মানভুমের একটি অজ্ঞাত প্রদেশ। ভাবিতেছিলাম এখানে কোথায়, কেমন করিয়া—! অর্ধপথেই চিন্তাটিকে ত্যাগ করিলাম। কালপুরুষের কক্ষপথের মানচিত্র কত বিচিত্র রেখায় বঙ্কিম ভঙ্গিতে চলিয়াছে, তাহা লইয়া চিন্তা করিয়া কি হইবে?

ভদ্রলোক স্টেশনেই ছিলেন, রওনা হইবার পূর্বেই তাঁহাকে টেলিগ্রাম করিয়াছিলাম। তাঁহার কথা আজ বার বার মনে হইতেছে, তাঁহাকে স্মরণ না করিয়া পারিতেছি না।

শীর্ণকায়, পরিপাটি সাহেবী পোশাক পরিয়া ওই অন্ধকার ছায়াপটের মধ্যে স্পষ্ট হইয়া কে ফুটিয়া উঠিলেন? মনে হইতেছে, তাঁহার ঠোঁট নড়িতেছে, গুড ইভনিং। চিনিতে পারেন আমাকে? গুড আফ্‌টারনুন, লেট মি, মানে, নিজেকে নিজেই পরিচিত ক'রে নিতে হচ্ছে, মার্জনা করবেন। আমি ধানবাদে প্র্যাক্‌টিস করি। মিস্টার সিন্‌হা আমারই ক্লায়েণ্ট। হ্যাভ ইউ গট ম্যাচেস? থ্যাঙ্ক ইউ।

আমি সিগারেট বাহির করিয়া তাঁহার সম্মুখে ধরিলাম।

ভদ্রলোক এক মুহূর্ত ইতস্তত করিয়া বলিলেন, খাব? আচ্ছা, আপনি দিচ্ছেন, বেশ। থ্যাঙ্ক্‌স।—বলিয়া একটি সিগারেট তুলিয়া লইয়া ধরাইয়া ফেলিলেন। তারপর বলিলেন, আমি অবশ্য বিড়ি খাই, মানে, সিন্স লাস্ট মুভ্‌মেণ্ট। তবে ডিফিকাল্‌টি কি জানেন, এই যেমন আজই ধরুন আপনি অফার করলেন, আমি কি রিফিউজ করব? প্রথম সাক্ষাতেই? অ্যাঁ, হোয়াট ডু ইউ সে?

কি বলিব ভাবিয়া পাইলাম না, তাঁহারই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া প্রথম সাক্ষাতে তাঁহার কথাকেই সমর্থন করিয়া বলিলাম, আজ্ঞে হ্যাঁ, তা তো বটেই।

ভদ্রলোক বলিলেন, থ্যাঙ্ক ইউ।

চারিদিক চাহিয়া বলিলাম, তারপর চন্দ্রনাথ কোথায়? কি বিপদ তার?

বাধা দিয়া ভদ্রলোক বলিলেন, ওয়েট প্লিজ। দিস ইজ নট দি প্রপার প্লেস, ইউ সি।

বললাম, তা হ'লে কোথায় যাওয়া যাবে?

ওয়েল, লেট মি থিঙ্ক। কোথায় যাব একটু ভেবে নিই। ওয়েল, মানে বুঝতে পারছেন তো, মক্কেলের কথা তৃতীয় ব্যক্তিকে জানিতে দেওয়া আমাদের প্রফেশনে ভব্যতার বাইরে। কিন্তু ইউ সি, নিরুপায় হয়ে আপনাকে জানাতে বাধ্য হচ্ছি। ইয়েস, আমি নিরুপায়, ইউ আণ্ডারস্ট্যাণ্ড মাই ডিফিকাল্‌টিস্‌, অ্যাঁ?

ভদ্রলোকের কায়দাকানুনের চাপে আমি হাঁপাইয়া উঠিতেছিলাম, বলিলাম, হ্যাঁ, কিন্তু এখানে এরকম ভাবে দাঁড়িয়ে—

ওয়েল, ইউ সি, আমি একটা নির্জন জায়গা খুঁজছি। নো থার্ড ম্যান।

চারিদিক চাহিয়া দেখিলাম, নির্জনতার অভাব নাই, চারিদিকেই জনহীন প্রান্তর, আর পরিচ্ছন্ন বসিবার স্থানেরও অভাব নাই। দেশটাই পাথরের, চারিদিকে শুধু পাথর, পাথর আর পাথর। পাথরের শুধু স্তূপই নয়, ধরণীর বুকে এখানে ওখানে সমতল পাথরের অঙ্গন যেন কে বাঁধাইয়া রাখিয়াছে, তাহারই আশেপাশে পাথরের স্তূপ। যেন কোন চঞ্চলা মেয়ের দল এখানে খেলা করিতে আসে, তাহারা খেলাঘর সাজাইয়া রাখিয়া ঘরে গিয়াছে। সেই দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া বলিলাম, বসবার জায়গার অভাব কি, বলুন না, ওই একটা বাঁধানো জায়গায় গিয়ে বসি।

ভদ্রলোক ঘন ঘন বার দুই ভুরু তুলিয়া বলিলেন, ওয়েল, খুব ভাল বলেছেন, কথাটা মনেই হয়নি আমার। ওয়েল, কুলি, কুলি!

ছোট স্টেশন, কুলি ছিল না, ভদ্রলোক বিব্রত হইয়া বলিলেন, ন্যাস্টি স্টেশন, একটা কুলি নেই। আপনার লগেজ দুটো—

বাধা দিয়া বলিলাম, এইজন্তে কুলি খুঁজছেন আপনি? চলুন, এ আমার দুহাতেই দুটো যাবে। সামান্ত জিনিস, কুলি কি হবে?

সত্যই সামান্ত জিনিস, ছোট একটা সুটকেস ও ছোট্ট একটা বিছানা।

ভদ্রলোক বিব্রত হইয়া বলিলেন, দিন দিন, আমাকে একটা দিন। না না না, সে হবে না, লেট আস শেয়ার। না না, দিন, নইলে আমি দুঃখিত হব।

অগত্যা ভদ্রলোককে সুটকেসটাই দিলাম। ভদ্রলোক সুটকেসটি হাতে লইয়া দেখিয়া বলিলেন, বিউটিফুল, সুন্দর জিনিসটি তো। অভদ্রতা মাপ করবেন, কত দাম মশায় এটার?

দাম মনে ছিল না, বলিলাম, ঠিক মনে নেই, তবে বেশি নয়, পাঁচ টাকার মধ্যে।

ভদ্রলোক তখন সুটকেসটা দেখিতেছিলেন, বলিলেন, রঙটি খুব সুন্দর, ফিনিশও খুব ভাল। সত্যিই জিনিসটি ভাল। কিনব আমি একটা।

একটা প্রস্তর-অঙ্গনে বসিয়া বলিলাম, এবার বলুন তো, ব্যাপার কি? চন্দ্রনাথ এখানে কোথা থেকে এল?

ভদ্রলোক বলিলেন, যতদূর আমি জানি, কানপুর থেকে।

আমি প্রতীক্ষা করিতেছিলাম আরও শুনিবার জন্ত, কিন্তু ভদ্রলোক আর একটি কথাও বলিলেন না। আমি অগত্যা আবার প্রশ্ন করিলাম, তারপর?

তিনি উত্তর দিলেন, ওয়েল, কি জানতে চান বলুন?

বলিলাম, সে এখানে কি করে?

এখানে চন্দ্রপুরা ফায়ার-ব্রিক্স অ্যাণ্ড পটারীজ ওয়ার্কসের মালিক তিনি।—বলিয়াই তিনি চুপ করিয়া গেলেন। আমি বুঝিলাম, ভদ্রলোক অস্থিমজ্জায় ঘরে-বাইরে খাঁটি উকিল, বাজে কথা তিনি বলেন না।

বহুকষ্টে তাঁহার নিকট সংগ্রহ করিলাম, চন্দ্রনাথ এখানে আসিয়া এক ফায়ার-ব্রিক্সের কারখানা খুলিয়াছে। প্রায় বৎসর পাঁচেক পূর্বে সে এখানে আসিয়া এক অনুর্বর জনহীন প্রান্তর বন্দোবস্ত লইয়া সেইখানে এই কারখানা পত্তন করে। চন্দ্রনাথের অমানুষিক পরিশ্রমে এবং শক্তিতে সে কারখানা এক সর্বাঙ্গসুন্দর প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। সেই সময়েই ভদ্রলোকের সহিত চন্দ্রনাথের আলাপ হয়। বলিতে বলিতে এতক্ষণে যেন ভদ্রলোকের একটা উচ্ছ্বাস দেখা গেল। তিনি একসঙ্গে অনেকগুলি কথা এবার বলিলেন, হি ইজ এ জিনিয়াস! ওয়াণ্ডারফুল ম্যান! এ রকম লোক আমি চোখে দেখিনি। আমি তাঁকে দেখেছি, বিশ্বাস করুন আমাকে, নিজের হাতে তিনি ভাটা গেঁথেছেন, ওই সমস্ত ডার্টি লেবারারদের সঙ্গে। তাঁর স্ত্রী, সি ইজ এ বিউটি, স্বর্গের দেবীর মত রূপ, তিনি সুদ্ধ নিজে পরিশ্রম করেছেন। আর তিনি নিজে আবার সেই কারখানা হারাবার জন্তে যেন পণ করে বসেছেন। এ যেন তাঁর ডিটারমিনেশন।

তিনি দুই কাঁধই বার দুই ইংরেজী ধরনে ঝাঁকি দিয়া উঠিলেন। তারপর আবার তিনি নীরব।

আমি প্রশ্ন করিলাম, হারাবার জন্ত পণ করেছেন মানে? কি বলছেন আপনি?

আবার বার দুই কাঁধ-ঝাঁকি দিয়া তিনি বলিলেন, ওয়েল, সেই তো হ'ল কথা। নাউ ইউ হ্যাভ কাম, মানে এতক্ষণে আপনি আসল কথায় এলেন।

বলিয়াই তিনি নীরব হইলেন। আমি বিরক্ত হইয়া বলিলাম, সেই তো জানতে চাচ্ছি আমি।

তিনি উত্তর দিলেন, ওয়েল, সেই তো আমিও বলছি।

বহুকষ্টে অনেক প্রশ্ন করিয়া জানিলাম, চন্দ্রনাথ এখনও কারখানা বাড়াইবার জন্যে পাগল হইয়া উঠিয়াছে। সেইজন্য চক্রবৃদ্ধিহারে উচ্চ সুদে সে ওই কারখানা মর্টগেজ দিতে উদ্যত হইয়াছে। মহাজন একজন মাড়োয়ারী। উকিলবাবুর ধারণা, এই মর্টগেজ হইলে আর রক্ষা নাই, কারখানা মাড়োয়ারীর হাতে চলিয়া যাইবে।

তিনি বলিলেন, ওয়েল, ইউ সি, চন্দ্রনাথবাবু ফকির হয়ে যাবেন, যাকে বলে রুইন্‌ড্ ম্যান। মহাজন দয়া করবে না।

ভাবিয়া দেখিলাম, উকিলবাবুটির কথা সত্য। কিন্তু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলাম, আমাকে কিন্তু মিথ্যে আনালেন উকিলবাবু, সে কারও পরামর্শ নেবার লোক নয়। সে তো আপনি নিশ্চয় জানেন।

অভ্যাসমত কাঁধে ঝাঁকি দিয়া ভদ্রলোক বলিলেন, ওয়েল লেট আস্—

তিনি নীরব হইলেন। তারপর কয়েক মুহূর্ত পরে অকস্মাৎ আমার হাত দুইটি চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, দেখুন, এ আপনাকে পারতেই হবে। তাঁর সঙ্গে যে কত লোকের সর্বনাশ হবে—

তিনি যেন শিহরিয়া উঠিলেন। এই সময়ে একখানা গরুর গাড়ি আসিয়া দাঁড়াইল, ভদ্রলোক বলিলেন, ওয়েল, তা হ'লে আসুন আপনি।—বলিয়া আমার হাতটা ধরিয়া একটা ঝাঁকি দিয়া দিলেন। তারপর বলিলেন, ওয়েল গুড্ লাক। কাল সকালেই আমি আসছি।

গাড়িতে জিনিসপত্র উঠাইয়া দিলাম, নিজে উঠিলাম না। সুন্দর রাস্তা, সুন্দর দেশ। চড়াইয়ে উতরাইয়ে অতিকায় তরঙ্গায়িত ভঙ্গিতে রাস্তা সোজা চলিয়া গিয়াছে। দুই পাশে শাল ও পলাশের বন দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত, মধ্যে মধ্যে সাঁওতালদের পল্লী। সন্ধ্যার বিলম্ব ছিল না, অস্তগামী সূর্যের আলোয় চারিপাশে পরেশনাথ গিরিশ্রেণী পরিষ্কার দেখা যাইতেছে। একটা চড়াইয়ের মাথায় উঠিয়া চোখে পড়িল, বাঁ পাশে দূরে প্রান্তরের উপর সারি সারি ধূমায়মান চিমনি, বাড়িঘর, শাল-পলাশ বন-বেষ্টনীর মধ্যে সে যেন একখানি ছবির মত মনে হইতেছিল। গাড়িখানা বাঁ-পাশেই একটা পরিচ্ছন্নতর ছোট রাস্তায় মোড় ফিরিল। রাস্তার ধারে একটা বড় কাঠের প্লেটে লেখা—ওয়ে টু চন্দ্রপুরা ফায়ার-ব্রিক্‌স্ ওয়ার্কস্—প্রাইভেট রোড। অন্ধকার হইয়া আসিতেছিল, পথ আর ভাল দেখা যায় না, মাটির দিকে চাহিয়া পথ চলিতেছিলাম। কতক্ষণ পর গাড়োয়ানকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আর কতদূর রে বাবা?

গাড়োয়ানটা বলিল, হুই যি বাবু, আলো দেখাইছে।

মুখ তুলিয়া চাহিলাম। সম্মুখে সারি সারি আলো অকম্পিতভাবে জ্বলিতেছে, উপরে আকাশের বুকে অন্ধকার চিরিয়া চিমনির মুখে আগুনের শিখা নাচিতেছে, যেন সারি সারি কম্পমান ধূমকেতু।

অল্পক্ষণের মধ্যেই কারখানায় আসিয়া পৌঁছিলাম। রাস্তার ধারে ধারে বিজলী বাতি জ্বলিতেছে। ডান পাশে পশ্চিম দিকে কারখানার প্রাঙ্গণে সারি সারি গোলাকার ভাটাগুলার ফায়ার-প্লেসে দাউদাউ করিয়া কয়লা জ্বলিতেছে। মিল-হাউসের বিপুল ঘর্ঘর শব্দে স্থানটা মুখরিত।

সংবাদ লইয়া জানিলাম, সাহেব আছেন মিল-হাউসে, এঞ্জিনে কি গোলমাল হইয়াছে, তাহা লইয়া তিনি ব্যস্ত।

মীরা আমাকে দেখিয়া আনন্দে যেন প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। আজ পরিষ্কার বাংলায় বলিল, আপনি, সত্যি আপনিই!

হাসিয়া বলিলাম, দেখুন লক্ষ্য ক'রে, মাটিতে আমার ছায়া পড়েছে, অশরীরী আমি নই। জীবন্ত আমিই আপনার সম্মুখে।

মীরা সলজ্জভাবে বলিল, তাই কি আমি বলছি? কিন্তু আপনার শরীর যে বড় খারাপ।

মুগ্ধভাবেই তাহাকে দেখিতেছিলাম। উত্তর দিয়া বলিলাম, আপনি কিন্তু উজ্জ্বলতর হয়ে উঠেছেন। আপনার নাম হওয়া উচিত ছিল—দীপ্তি!

সবল হৃষ্টপুষ্ট বছর পাঁচেকের একটি শিশু স্থানটাকে কলহাস্যে মুখরিত করিয়া বাগানের ফটকটাকে সজোরে ঠেলিয়া খুলিয়া ঝড়ের মত আসিয়া উপস্থিত হইল। অনুমানে চিনিলাম, চন্দ্রনাথের শিশু। তাহার হাতে বেশ ভারী ফায়ার-ক্লের তৈয়ারি বল।

মীরা বলিল, প্রণাম কর জিঞ্জির, তোমার মামা উনি।

তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া বলিলাম, নাম থাকবে ঠিক হয়েছিল কুমারকিশোর, কিন্তু জিঞ্জির হ'ল কেন আবার?

মীরা বলিল, আপনার দোস্ত বলেন কুমারকিশোর, আমি ওকে বলি জিঞ্জির।

শিশু কিন্তু কোলে থাকিতে চাহিতেছিল না, সে ঝুলিয়া মাটিতে নামিয়া পড়িয়া মায়ের দিকে ছুটিল।

মীরা বলিল, যাও, শুয়ে পড়গে যাও। না না, এখন কোলে না—যাও, যাও।

আয়া তাহাকে লইয়া চলিয়া গেল। আমি এবার বাড়ির চারিদিক চাহিয়া দেখিলাম, প্রাসাদের বনিয়াদ আরম্ভ হইয়াছে। সুন্দর সুগঠিত সুদৃঢ় পাথরে গড়া একতলা বাংলো।

পাশে চাহিয়া দেখিলাম, মীরা নাই। সে তখন চলিয়া গিয়াছে; বোধ হয় আমারই পরিচর্যার ব্যবস্থার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। বেয়ারাটা আমাকে একটা কক্ষের মধ্যে লইয়া গেল। কক্ষের মধ্যেও দেখিলাম, বিপুল না হউক, ঐশ্বর্য যাহা আছে তাহা পর্যাপ্ত, মূল্যের দিক দিয়াও তুচ্ছ নয়।

একখানা চেয়ারে বসিয়া ডাকিলাম, মীরা দেবী!

মীরা আসিয়া নীরবে আমার সম্মুখে দাঁড়াইল। আমি তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, নিরুচ্ছ্বসিত মৃন্ময় মূর্তি যেন সে। আমাকে দেখিয়া যে দীপ্তি তাহার মধ্যে ফুটিয়া উঠিতে দেখিয়াছিলাম, তাহাও নিঃশেষে স্তিমিত হইয়া গিয়াছে। রজনীর শেষ মুহূর্তের আকাশের মত সে স্তিমিত, একটি নক্ষত্রও আর সেখানে ফুটিয়া নাই।

নষ্ট করিবার মত সময় আমার ছিল না, তাড়াতাড়ি আমি কাজের কথা আরম্ভ করিলাম। মীরাকে সকল কথা বলিয়া বলিলাম, আপনি নিষেধ করেছেন?

প্রশান্তভাবে মীরা বলিল, না।

বলিলাম, আমি বলব, আপনি আমার সঙ্গে যোগ দিন।

মীরা আবার বলিল, না।

প্রশ্ন করিলাম, আপনার কি মনে হয়, এতে ভাল হবে?

অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া মীরা বলিল, জানি না।

আর কথা অগ্রসর হইতে পাইল না, চন্দ্রনাথ আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার সর্বাঙ্গে

তেলকালি মাখা, পরনে শুধু খাকী হাফপ্যাণ্ট, ঊর্ধ্বদেহ অনাবৃত, পায়ে বুট। সেই দুই হাতে আমাকে টানিয়া বুকে জড়াইয়া ধরিল, তুই, নরু! কেমন ক'রে জানলি আমার ঠিকানা?

আমি বলিলাম, কিন্তু আমি যে মরে যাচ্ছি তোর পেষণে।

হাসিয়া সে আমায় ছাড়িয়া দিল। আমার জামাকাপড় তখন তেলকালিতে রঞ্জিত হইয়া গিয়াছে।

সেই রাত্রেই সে আমায় কারখানা দেখাইয়া ছাড়িল।

আগুন লইয়া খেলা, ভাটাগুলার ফায়ার-প্লেসের আগুনের উত্তাপ ভাটার ভিতর দিয়া নীচের ফ্লোরের মধ্য দিয়া হু হু শব্দে জলের স্রোতের মত বহিয়া চলিয়াছে, উপরে চিমনির মাথায় তাহারই শিখা নাচিতেছে। কালো মাটি পুড়িয়া দুধের মত সাদা হইয়া বাহির হইয়া আসিতেছে। সমস্ত সে আমাকে বুঝাইয়া দিতেছিল।

মিল-হাউসে মাটি গুঁড়া হইতেছে, মাখা হইতেছে। ব্রিক মেশিনের মধ্যে আসিয়া সুন্দর ইটের আকার লইয়া বাহির হইয়া আসিতেছে। প্রত্যেক খুঁটিনাটি সে আমাকে দেখাইয়াছিল, কিন্তু আজ সে সমস্ত স্মরণ করিতে পারিতেছি না। বোধ হয় যন্ত্র-রাজ্য চোখে দেখিয়াছিলাম, কিন্তু মনের দৃষ্টি সবিস্ময়ে দেখিয়াছিল ওই যন্ত্র-রাজ্যের রাজাকে।

চন্দ্রনাথের সেই কথাই মনে পড়িতেছে, বাড়ি ফিরিয়া সে বলিল, এই কারখানা আরম্ভ করেছি নরু, আমি আর মীরা। দু'জনে নিজে হাতে কাজ করেছি—আদিম কালের মানব-দম্পতির মত। মীরা ছিল আমার সাহায্যকারিণী। মনে পড়ে তোমার মীরা, একদিন, কাদা আনতে আনতে উল্টে প'ড়ে তোমার সমস্ত মুখ কাদায় ঢেকে গিয়েছিল!—বলিয়া হা হা করিয়া সে হাসিয়া উঠিল।

তারপর হাসি থামাইয়া আমাকে বলিল, নরু, তোর কেমন লাগল কারখানা?

আমি বলিলাম, সুন্দর, চমৎকার হয়েছে। প্রত্যেক বন্দোবস্তটি সুন্দর হয়েছে চন্দ্রনাথ। আমাদের দেশে এত উপাদান রয়েছে—

বাধা দিয়া চন্দ্রনাথ বলিল, এত ছোট এতটুকু একটা জিনিস, একে আরও বাড়াচ্ছি আমি, আর একটা মিল-হাউস, আরও কিল্‌ন্, একদিকে করব পটারীজ, পুতুল-জার-ব্র্যাকেট-এর একটা শাখা খুলব, আর সিলিকা-ব্রিক্‌সেরও ডিপার্টমেণ্ট্ খুলব। তারপর, এরই পাশে খুলব এক লোহার কারখানা, চন্দ্রপুরা আয়রন ওয়ার্কস্। সাইট, জমি সব ঠিক ক'রে রেখেছি, প্ল্যানও করেছি! কাল সে সব দেখিয়ে বুঝিয়ে দোব। মাইলের পর মাইল বিরাট কারখানা এইখানে দেখতে পাবি, আয় আয়, ঘরগুলো সব দেখাই তোকে।

চন্দ্রনাথ আমাকে প্রতিটি ঘর দেখাইল। তাহার ঘরের প্রতি কোণের তুচ্ছতম বস্তুটির প্রতি আমার মনোযোগ আকর্ষণ করিল। একটা ঘরে দেখিলাম, চারিপাশের আলমারীর মধ্যে রাশি রাশি বই। সবই প্রায় বিজ্ঞানের বই। একটা আলমারীর মধ্যে কতকগুলি বাংলা বই রহিয়াছে দেখিলাম, তাহার মধ্যে দেখিলাম, আমার বইগুলি প্রায় সবই রহিয়াছে।

চন্দ্রনাথ বলিল, তোর বইগুলো সবই আমি পড়ি। মীরা প'ড়ে আমাকে শোনায়। বেশ লাগে রে, অনেক পুরোনো লোককে মনে পড়ে।

একটু নীরব থাকিয়া সে বলিল, আমার সবচেয়ে ভাল লাগে কি জানিস? প্রিয়তম বই আমার, ন্যুট হ্যাম্‌সুনের 'গ্রোথ অব দি সয়েল'। পাঁচখানা বই কিনেছি, আগেরগুলো ছিঁড়ে গিয়েছে।

মীরা আসিয়া প্রশান্তভাবে বলিল, খাবার জুড়িয়ে গেল।

চন্দ্রনাথ মহাব্যস্ত হইয়া বলিল, চল চল। বাগানের মধ্যে টেবিল পাততে বল।

তিনজনে বাগানের মধ্যে বসিলাম, বাবুর্চি খাবার পরিবেশন করিতেছিল। সহসা কি একটা যন্ত্রের ঘণ্টা ঝন্‌ঝন্ শব্দে বাজিয়া উঠিল। চন্দ্রনাথ তাড়াতাড়ি উঠিয়া গিয়া দেখিয়া শুনিয়া টেলিফোনের রিসিভার তুলিয়া ফোন করিতে বসিল। কারখানার সঙ্গে ফোনের সংযোগ রাখা হইয়াছে। চন্দ্রনাথ বলিতেছিল, এক্ষুনি তাড়াও ওকে, এক্ষুনি চার্জ কেড়ে নাও। কাল আমি ব্যবস্থা করব। অন্য লোক দাও ওখানে। অমনোযোগী লোক, যে কাজে ফাঁকি দেবে সে ক্রিমিন্যাল, তার চেয়েও সে শয়তান।

আমি অন্যমনস্কভাবেই আকাশের দিকে চাহিলাম। সেখানে দেখিলাম, ছায়াপথের পাশেই কালপুরুষ আপন কক্ষপথে চলিয়াছে—সেই দীপ্তি, সেই ভঙ্গি, সেই আকৃতি।

কিন্তু যে উদ্দেশ্যে যাওয়া সে উদ্দেশ্য ব্যর্থ ই হইল। আমার অনুমান মিথ্যা হয় নাই। পরদিন প্রাতঃকালেই, 'আর্লি মর্নিং'এ উকিলবাবুটি আসিয়া হাজির হইলেন।—সেই নিখুঁত সাহেবী পোশাক, সেই গম্ভীর মুখ।

চন্দ্রনাথ বলিল, গুড্ মর্নিং।

হাতটা বাড়াইয়া দিয়া ভদ্রলোক বলিলেন, গুড্ মর্নিং। তারপর আমার দিকে অপরিচিতের মত চাহিয়া বলিলেন, ওয়েল, মিস্টার সিন্‌হা, একে তো চিনতে পারলাম না ?

চন্দ্রনাথ বলিল, ভাল, পরিচয় করিয়ে দিই, ইনি আমার বন্ধু এবং সুলেখক, মানে, আপনি বাংলা বই পড়েন তো ?

গম্ভীরভাবে ভদ্রলোক বলিলেন, ওয়েল, ভেরি রেয়ার, খুব কম, তবে ওঁর বই ভালই হবে, বেশ বেশ। এবার আমার পরিচয়টা শুনে নিন। মিস্টার সিন্‌হা বলুন ওঁকে আমার পরিচয়টা।

চন্দ্রনাথ ঈষৎ হাসিয়া বলিল, উনি ধানবাদের উকিল—

ভদ্রলোক বলিলেন, মিস্টার সিন্‌হার লিগাল অ্যাড্‌ভাইসার।

তারপরই তিনি কাজের কথা আরম্ভ করিলেন। চন্দ্রনাথ কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তার সেই এক উত্তর, আপনার সুদের ক্যালকুলেশন যেমন ম্যাথম্যাটিক্যাল, আমার প্রোগ্রেসের হিসেবও তেমনই ম্যাথম্যাটিকাল।

ভদ্রলোক বলিলেন, ওয়েল, তবু আপনি একবার সুদের হিসেবটা দেখুন। দিন তো স্যর, একবার আপনার কলমটা।

আমার দিকে তিনি হাত বাড়াইয়া দিলেন। তারপর খসখস করিয়া একখানা কাগজে হিসাব করিয়া চন্দ্রনাথের সম্মুখে ধরিলেন, ইউ সি—

কাগজটি লইয়া টেবিলের উপরে রাখিয়া দিয়া চন্দ্রনাথ বলিল, কেন বাধা দিচ্ছেন আপনি ? কারখানার এক্সটেন্‌শন ফেলে রাখতে আমি পারি না। যদি যায়, আমার মালিকানা যাবে। কারখানা থাকবে।

এই সময় মীরা আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার পিছনে বেয়ারার হাতে চায়ের সরঞ্জাম। মীরা নিজে চা প্রস্তুত করিয়া হাতে হাতে আগাইয়া দিতেছিল। উকিলবাবুটি অতিমাত্রায় ভদ্রতা প্রকাশ করিতে গিয়া প্রায় চায়ের পেয়ালায় তুফান তুলিয়া ফেলিলেন। মীরা চায়ের পেয়ালা আগাইয়া ধরিতেই তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন, সঙ্গে সঙ্গে কাপসুদ্ধ উল্টাইয়া ভদ্রলোকের কোটের উপর পড়িয়া গেল। মীরা অপ্রস্তুত ; ভদ্রলোক যেন বিবর্ণ হইয়া গেলেন। চন্দ্রনাথ

বলিল, খুলে ফেলুন, কোটটা খুলে ফেলুন আপনি, এক্ষুনি ওটাকে সাবান দিয়ে পরিষ্কার ক'রে দিক, ঘরে আমার ইস্ত্রিও আছে।

ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি বলিলেন, না না না, থাক থাক, না না না।

কিন্তু চন্দ্রনাথ শুনিবার লোক নয়, সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিয়া নিজে জোর করিয়া কোটটা খুলিয়া লইল। তারপর সে এক শোচনীয় দৃশ্য, আমি জীবনে ভুলিব না। ভদ্র-লোকের কোটের নীচে শতছিন্ন এক সৌখিন ছিটের কামিজ যে কাহিনী প্রকাশ করিয়া দিল, তাহার আঘাতে সকলে নতমস্তকে নির্বাক হইয়া রহিলাম। ভদ্রলোক নিজেই কোটটা গায়ে দিয়া বলিলেন, ছিটটা বড় সুন্দর, ওটার মমতা আমি কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারি না।

আমরা তবুও নির্বাক।

তারপর আবার তিনি বলিলেন, ওয়েল মিসেস্ সিন্‌হা, আপনি বুঝিয়ে বলুন মিস্টার সিন্‌হাকে, এ হচ্ছে খাল কেটে কুমীর ডেকে আনা।

আমি বলিলাম, মীরা দেবী, আপনি চন্দ্রনাথকে অনুরোধ করুন। আমাদের ধারণা এতে ভবিষ্যতে ভাল হবে না।

মীরা বলিল, উনি তো বলছেন, ভাল হবে।

উকিলবাবু অবাক হইয়া গেলেন, হতাশ হইয়া তিনি বিদায় লইলেন।

মীরা চলিয়া গিয়াছিল। চন্দ্রনাথ বলিল, আশ্চর্য! মীরা কোন দিন চঞ্চল হয় না! ও যেন কি রকম হয়ে যাচ্ছে দিন দিন।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস আমার অজ্ঞাতসারেই যেন ঝরিয়া পড়িল। হঠাৎ মনে পড়িল আমার ফাউন্টেন-পেনটার কথা। উকিলবাবু ভুলিয়া লইয়া গেলেন নাকি?

চন্দ্রনাথ শুনিয়া ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, ভুলে সৌখিন জিনিস প্রায়ই উনি নিয়ে যান। ওটার আশা তুই ছেড়ে দে।

আমি একটা রূঢ় আঘাত পাইলাম, এমন মানুষ, অথচ—

চন্দ্রনাথ বলিল, অত্যন্ত গরীব ভদ্রলোক। ওই ধরনের কথাবার্তার জন্যে প্র্যাক্‌টিস একেবারে নেই। আমি ওঁকে উকিল নিযুক্ত ক'রে রেখেছি, চল্লিশ টাকা ক'রে দেই মাসে, তাইতেই কোন রকমে চলে। কিন্তু ওই একটি স্বভাব, লক্ষ টাকার তোড়া তুমি ফেলে রাখ, কিছু যাবে না। অথচ সামান্য সৌখিন জিনিস, তার লোভ উনি সম্বরণ করতে পারেন না।

নির্বাক হইয়া কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলাম, চন্দ্রনাথও নীরব।

কিছুক্ষণ পরে চন্দ্রনাথ উঠিয়া বলিল, ব'স তুই, আমায় বেরুতে হচ্ছে।

বাধা দিয়া বলিলাম, কয়েট মিনিট অপেক্ষা কর। তোর দাদার কথা, বউদির কথা কিছু বলব তোকে।

সে বলিল, থাক নরু, জীবনে নিজের স্ত্রী-পুত্রই ক্রমশ আমার কর্মপথে বাধা ব'লে মনে হচ্ছে। আবার দাদা বউদি—এদের নিয়ে চিন্তা করতে আমি পারব না। যদি দুর্দশা অভাব ঘটে থাকে, কিছু টাকা আমি বরং দিতে পারি।

অত্যন্ত আহত হইয়া বলিলাম, থাক ব'লে আবার কেন কথা বাড়ালি চন্দ্রনাথ, কথাটা সত্যিই থাক।

সে বলিল, কিন্তু অবিচার তুই আমার ওপরেই করছিস।

বাধা দিয়া বলিলাম, বিচার করবার আমার অধিকার নেই, মিথ্যে তুই অনুযোগ করছিস।

রাগ করিসনি, ফিরে আসি আমি।—বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল। আর আমি সে কথা উত্থাপন করিলাম না। আশ্চর্য, সেও আর কোন প্রশ্ন করিল না।

বিদায় লইবার সময় চন্দ্রনাথের সহিত দেখা হইল না, সে ঋণ করিবার ব্যাপার লইয়া বিশেষ ব্যস্ত, স্নান-আহারেরও অবসর নাই। মীরার নিকট বিদায় লইলাম, আসি মীরা দেবী।

নিস্পৃহ শান্ত ভাবেই মীরা বলিল, আসুন।

প্রশ্ন করিলাম, খোকা কই, তাকে তো দেখলাম না খুব বেশি ?

মীরা বলিল, সে তো এখানে থাকে না।

বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিলাম, কোথায় থাকে সে ?

পাশের ছোট অত্যন্ত সাধারণ একটি বাংলোর দিকে আঙুল দেখাইয়া মীরা বলিল, ওই বাংলোটায় থাকে সে। আয়া তাকে মানুষ করে, মাস্টার আছেন একজন।

আমি বলিয়া উঠিলাম, না না না। এমনভাবে নিজেকে বঞ্চিত করবেন না আপনি, ছেলেকে কাছে রাখবেন।

মীরা বলিল, ভাল লাগে না আমার। অত্যন্ত চঞ্চল, বড় দুর্দান্ত, আমার কেমন ভাল লাগে না।

আমি মীরার কথা ভাবিতে ভাবিতেই গাড়িতে উঠিলাম। অন্ধকার রাত্রি, চোখের সম্মুখে আকাশের পূর্বপ্রান্তে সপ্তর্ষিমণ্ডল ট্রেনের সমগতিতে সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছে। সপ্ত তারকার ঈষৎ পার্শ্বে আর একটি তারা ঝিকমিক করিয়া স্তিমিত ভাবে জ্বলিতেছে। কখনও দেখা যায়, কখনও দেখা যায় না।

মনে মনে মীরার নাম দিলাম অরুন্ধতী।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বিছানা বিছাইয়া শুইয়া পড়িলাম। ঘুমঘোরে সেদিন স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম হেড মাস্টার মহাশয়কে। চন্দ্রনাথ যেন তাঁহার সম্মুখে দৃপ্ত বিদ্রোহের ভঙ্গিতে দাঁড়াইয়া আছে, আর মাস্টার মহাশয় তাহাকে শাসন করিবার জন্য ক্রুদ্ধস্বরে চীৎকার করিতেছেন, কেষ্ট, কেষ্ট, আমার বেত নিয়ে এস।

চন্দ্রনাথ অবজ্ঞার ভঙ্গিতে হাসি হাসিয়া চলিয়া গেল।

মাস্টার মহাশয় করুণ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, নরু, চন্দ্রনাথ আমার কথা শুনলে না !

নিদ্রা ভাঙিয়া উঠিয়া বসিয়া অনুভব করিলাম, আমার চোখ দিয়া জল পড়িয়াছে।

বায়ুমণ্ডলে আলোড়ন তুলিয়া ট্রেন ঝড়ের গতিতে ছুটিয়াছে। বাতাসের সঙ্গে ধুলা কাঁকর আসিয়া চোখে পড়ে। চোখ ফিরাইয়া ওপাশের দূরবর্তী জানালাটার দিকে চাহিলাম। ওপাশের আকাশের প্রান্তে জ্বলিতেছিল ভোরের শুকতারা।

তেরো

আর চিন্তা করিয়া স্মরণ করিতে হইতেছে না, স্মৃতি যেন ক্রমশঃ উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিতেছে।

ইহার পর-বৎসরই আবার একবার চন্দ্রনাথের ওখানে গিয়াছিলাম। উল্লেখযোগ্য কিছু

ঘটে নাই। চন্দ্রনাথ সেই তেমন ভাবেই জীবনকক্ষপথে চলিয়াছে। মীরাও সেই স্তিমিত-প্রায় অরুন্ধতীর মত চলিয়াছে। মীরার কিন্তু একটা রূপ আমাকে বিস্মিত করিয়া তুলিল, মীরার বাহ্য রূপ। জীবনের দীপ্তি যতই স্তিমিত হউক, তাহার বাহ্য রূপের দীপ্তি ক্রমশ যেন উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিতেছে। পঁচিশ-ছাব্বিশ বৎসর বয়সেও মীরাকে অষ্টাদশী-তরুণী বলিয়া বোধ হয়।

হীরুর সংবাদ রাখি না ; সে নাকি সেই বর্বরা মেয়েটাকে লইয়া তাহার জমিদারির কোন জঙ্গল-মহলের মধ্যে ঘর বাঁধিয়াছে। মাঝে মাঝে দেখিবার ইচ্ছা হয়, কিন্তু অবসর এবং সুবিধা হয় না। সে নাকি এক সাঁওতালের দেশ। বনে বন্যজন্তুরও অভাব নাই। যাওয়া-আসারও নাকি অনেক অসুবিধা। আমি মনে মনে ওই যাযাবরীকে আশীর্বাদ করি, দূর হইতেই মুগ্ধ দৃষ্টির আরতি তাহাকে নিবেদন করি, ধন্য যাদুকরীর যাদু! ধন্য বন্য শ্যামলতার শক্তি! হীরুর মন-বনস্পতিকে সে ঘনপল্লবে আচ্ছাদিত করিয়াছে।

নিশানাথবাবুরও সংবাদ পাই নাই। বউদিদিকে পত্র লিখিতেও লজ্জা হয়, নিরুর পাত্র সন্ধান করিতে পারি নাই। পারি নাই নয়, চেষ্টাও তেমনি করি নাই। স্বার্থপরতা মানুষের স্বভাব। চন্দ্রনাথকে, নিশানাথকে দোষ দিই কেন, আপন স্বার্থের ভিড়ে আমিও যে পাগল। বইয়ের পর বই লিখিয়া চলিয়াছি, কাগজের উপর কালির আঁচড় যখন টানি, তখন সমস্ত যেন ভুলিয়া যাই। একটা গভীর বিয়োগান্ত গল্প লিখিয়া মনটা কেমন অবসাদগ্রস্ত হইয়া উঠিল। মুক্ত প্রান্তরের নিষ্কলুষ বায়ুর জন্য মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল। ভাবিলাম, হীরুকে আর যাযাবরীকে দেখিয়া আসি। কিন্তু এতখানি ঝঞ্ঝাট পোহাইতে মন ভয় পাইয়া গেল। বাহির হইয়া পড়িলাম চন্দ্রনাথ আর মীরার উদ্দেশে।

মীরা এবার বলিল, এবার আপনি খুব শিগগির শিগগির এসেছেন।

হাসিয়া বলিলাম, জানেন মীরা দেবী, আমাদের দেশে বলে—অরুন্ধতী না দেখতে পেলে জানতে হবে, ছ-মাসের মধ্যে মৃত্যু অবধারিত। আমি অরুন্ধতী দেখতে আসি।

মীরা আমার দিকে চাহিয়া রহিল শুধু, বিস্ময় তাহাতে ছিল, কিন্তু বিস্ময়ের মধ্যে থাকে যে ঔৎসুক্য, সে ঔৎসুক্য ছিল না। কারণ দৃষ্টির যে ভঙ্গিতে প্রশ্ন করে, সে ভঙ্গি তো কই দেখিলাম না। আমিও কোন উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া রহিলাম, মীরাও প্রশ্ন করিল না। কিছুক্ষণ পরে নিজেই বলিলাম, আমি আপনার নাম দিয়েছি কি জানেন? নাম দিয়েছি অরুন্ধতী।

এবার মীরা প্রশ্ন করিল, কেন?

বলিলাম, সপ্তর্ষিমণ্ডল দেখেছেন কোন দিন আকাশে?

দেখেছি।

আমাদের পুরাণে বলে, সেই সপ্তর্ষিমণ্ডলে সপ্ত মহর্ষির মধ্যে আছেন মহর্ষি বশিষ্ঠ। বশিষ্ঠ-পত্নী অরুন্ধতী পতিপরায়ণতার জন্যে বশিষ্ঠের পাশে স্থান পেয়েছে। ওই নক্ষত্রমণ্ডলের সঙ্গে সে ঘোরে ফেরে, অতি স্তিমিত তার আলোক। তার অসাধারণ পুণ্যজ্যোতি স্বামীর প্রভাকে পাছে ম্লান করে দেয়, তাই সে সযত্নে সে জ্যোতি লুকিয়ে রেখেছে।

মীরা বহুক্ষণ ধরিয়া নীরব থাকিয়া অবশেষে আমাকে বলিল, আপনি কি আমাকেই দেখতে আসেন?

বলিলাম, হ্যাঁ, মীরা দেবী, আপনার অনুচ্ছ্বসিত শান্ত-জীবন আমার বড় ভালো লাগে, রহস্য ব'লে মনে হয়।

মীরা স্বপ্নাচ্ছন্নের মত সম্মুখের বনভূমির দিকে চাহিয়া রহিল। আমার মনে হইল, সে যেন আপনার জীবনের সঙ্গে আমার কথাগুলি মিলাইয়া দেখিতেছে। কিছুক্ষণ পরে বলিল, দোস্ত, ওই যে নদীর ওপারে দেখছেন ঘন বন, এখান থেকে মনে হয় কত নিবিড়, কত রহস্য ওখানে। কিন্তু আমি ওখানে গিয়েছি, দেখেছি, অরণ্যভূমির কোন রহস্যই ওখানে নেই, অরণ্যও ওটা নয়, নিতান্ত বিচ্ছিন্নভাবে মিলিত অপরিপুষ্ট কতকগুলি শাল ও পলাশ গাছের মেলা।

আমি উত্তর দিলাম, রহস্য নিশ্চয় আছে মীরা দেবী, নইলে সীমান্ত থেকে যে দৃষ্টি তার দিকে নিবদ্ধ হয়, তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে কে? কাছে গিয়ে তাকে ধরতে পারি না, দেখতে পাই না, সেই তো রহস্যের ধর্ম্ম, কৌতুক করা যে তার স্বভাব। আপনার এই অগ্নিশিখার মত প্রদীপ্ত রূপময় দেহ, তার অন্তরালে নিতান্ত আবেগহীন শীতরাত্রির মত শীতল মন, এ যে সত্যই রহস্য।

মীরা নীরবে বসিয়া রহিল, যেন কত চিন্তা করিতেছে।

প্রথম মাঘের দ্বিপ্রহরে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। আকাশে তখনও স্বল্প মেঘসঞ্চার ছিল। সম্মুখে পশ্চিম দিকে পরেশনাথ গিরিশ্রেণী রক্ত-সন্ধ্যার আভায় অতি পরিস্ফুট দেখা যাইতেছিল। বৃষ্টিধৌত নীলাভার উপর রক্ত-সন্ধ্যার গাঢ় লালের আবরণী অঙ্গে দিয়া সে যেন নবরূপ ধরিয়াছে। যেন দীর্ঘকালের পর আজ এক বিরাট ব্যাধ স্নানান্তে গৈরিক উত্তরীয় অঙ্গে দিয়া বিলাস-বেশ করিয়াছে। এ পাশে দক্ষিণ দিকে বনভূমির পাতা ঝরিয়া গিয়াছে, রিক্ত শাখার ধূসরতায় বনভূমি উদাসিনীর মতো আকাশের দিকে চাহিয়া আছে। আমি ভাবিতেছিলাম, আবার বনভূমে কিশলয় দেখা দিবে, ফুল ফুটিবে; এখনই হয়তো ওই তপস্যাক্লিষ্ট শীর্ণ দেহের রস সঞ্চারিত হইয়া কাণ্ডের মধ্য দিয়া ঊর্দ্ধমুখে চলিয়াছে, হয়তো শাখার প্রান্তে প্রান্তে মঞ্জরীর অদৃশ্য মুঞ্জরণ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু মীরার রিক্ত উদাসীন জীবনে নবমঞ্জরী কবে কি ভাবে দেখা দিবে? হয়তো দিবে না।

সহসা মীরা প্রশ্ন করিল, কি ভাবছেন আপনি?

সম্মুখের দিকে আঙুল দেখাইয়া বলিলাম, বড় সুন্দর দৃশ্য, বড় ভালো লাগে আমার।

মীরা বলিল, পারেন যদি আসবেন কোন বসন্তকালে। শালে পলাশে মহুয়ায় তখন যে কি হয়ে ওঠে চারিদিক! অপরূপ, সে অপরূপ! সব লাল, সমস্ত রাঙা হয়ে ওঠে। তখন আমি একদিনও ঘরে থাকতে পারি না, বনে গিয়ে ব'সে থাকি আমি।

অনুরোধ করিলাম, চলুন না আজ একটু বেড়িয়ে আসি।

মীরা বলিল, না, ভাল লাগ্‌ছে না। আর কারও সঙ্গে বেড়াতে আমার কেমন ভাল লাগে না।

চন্দ্রনাথ আসিয়া ব্যস্তভাবে একখানা চেয়ার টানিয়া বসিয়া বলিল, খবর পেলাম তুই এসেছিস। কি ভয়ানক ব্যস্ত আমি; লোহার কারখানা আরম্ভ হয়ে গেছে। চল, তোকে দেখিয়ে নিয়ে আসি। মীরা, চা, জলদি আমাদের জন্যে চা হুকুম ক'রে দাও।

আমার দৃষ্টি এবার নিবদ্ধ ছিল উত্তর দিকের শস্যক্ষেত্রের দিকে। ঢালু জমির উপর ক্ষেত্রগুলি ক্রমশ নীচে নামিয়া গিয়াছে, ক্ষেত্রগুলিতে রবিশস্য পাকিতে শুরু করিয়াছে। শস্যশীর্ষভারে গাছগুলি মাটিতে গতায়ু হইয়া বিলুণ্ঠিত। এগুলির এ জীবনের মুঞ্জরণ শেষ হইয়া গেল, উহাদের

জাগরণ হইবে আবার পুনর্জন্মে।

সহসা মনে হইল, মীরার জীবন কি ওই শস্যজন্মের মত? মনটা বেদনায় টনটন করিয়া উঠিল।

শস্যলিপ্সু কৃষকের মত চন্দ্রনাথ মীরার জীবনটাকে ছাঁটিয়া নাড়িয়া তাহার জীবনের ফসলে নিজেকে সমৃদ্ধ করিল। নবজন্মে তাহার সৌভাগ্য কামনা করিয়া তাহাকে মনে মনে আশীর্বাদ করিলাম।

চন্দ্রনাথ তখন আপন মনেই বলিতেছিল, তিন স্কোয়ার-মাইল এখন আমার কারখানার পরিধি, কিন্তু লোহার কারখানা সম্পূর্ণ হ'লে আয়তন প্রায়—

অকস্মাৎ তাহার বোধ হয় খেয়াল হইল, আমি অন্যমনস্ক হইয়া তাহার কথা শুনিতেছি না। সে বলিল, কি ভাবছিস বল তো তুই?

ঈষৎ হাসি মুখে টানিয়া আনিয়া বলিলাম, কিছু না।

সে আবার আরম্ভ করিল, এবার এসে বোধ হয় কারখানা তুই চিনতেই পারবি না। নতুন কল্পনা আমার চমৎকার হয়েছে।

ইহার পর বৎসর তিনেকের জীবনেতিহাসের মধ্যে চন্দ্রনাথের সন্ধান মেলে না। এ সময়-টুকুর জীবনেতিহাস শুধু কর্মজীবনের ইতিহাস। একখানা দৈনিকের সম্পাদক-মণ্ডলের মধ্যে একটা চাকরি পাইয়া গিয়াছিলাম। তবে ইহার মধ্যে চন্দ্রনাথের কারখানার সংবাদ পাইয়াছি; দ্বিতীয়ত বৎসরের প্রথমেই আমাদের কাগজে চন্দ্রপুরা ওয়ার্কসের কয়েকখানা ছবিসহ একটা বিবরণ ছাপা হইয়া গেল। বিবরণে দেখিলাম, কারখানা আয়তনে অনেক বিস্তৃতিলাভ করিয়াছে।

আমি চন্দ্রনাথকে অভিনন্দিত করিয়া একখানি পত্র লিখিলাম, এবং চন্দ্রপুরা ওয়ার্কসের স্রষ্টার জীবনী ছাপিবার অনুমতি দিবার জন্য লিখিলাম। কয়েক ছত্রের একখানা উত্তরও পাইলাম, "ধন্যবাদ, কাজের চাপে মুহূর্ত অবসর নাই। তোমাদের কাগজে কারখানার বিবরণ দেখিলাম, কিন্তু অনেক ভুল আছে; আমার জীবনী এখনও ছাপিবার সময় আসে নাই, জীবনের এই সবে প্রারম্ভ। তোমার নতুন বই কিনিয়াছি, শেষ করিবার অবসর পাই নাই; অল্প অল্প করিয়া পড়িতেছি।"

মাত্র এইটুকু। মীরার কথা কিছু লেখা নাই। তাহার সম্বন্ধে নানা কল্পনা আমার মনে জাগিল। থাকিতে না পারিয়া মীরা ও খোকার কুশল-সংবাদ চাহিয়া আবার একখানা পত্র লিখিলাম। উত্তর পাইলাম, মীরা তেমনিই আছে। কুমারকিশোর এখানে নাই; তাহাকে স্কুলবোর্ডিংে দেওয়া হইয়াছে। সে সেখানে ভালোই আছে।

চৌদ্দ

আর এক বৎসর পর।

কাগজের কাজেই গিয়াছিলাম এলাহাবাদ। ফিরিবার সময় ফিরিতেছিলাম তুফান মেলে। ঝড়ের মত ট্রেনখানা চলিতেছে। ভাবিলাম, সার্থক সেই ব্যক্তির রস-কল্পনা, যে ট্রেনখানার নামকরণ করিয়াছিল—'তুফান মেল'। এই নামটিই আজ হাওড়া হইতে পাঞ্জাব পর্যন্ত ছড়াইয়া

গেল, অথচ সে হয়তো একজন কুলি।

ট্রেনেই কাগজপত্র খুলিয়া বসিলাম, কাগজের রিপোর্টটা জরুরী। কাগজপত্র বন্ধ করিয়া মনে মনে খসড়া করিতে বসিলাম। চিন্তাভারগ্রস্ত মন, পথপার্শ্বের ছবি চিত্তদ্বারে কোন আবেদন আনিতে পারিতেছিল না, সমস্ত যেন অজ্ঞাত কোন ভাষায় লেখা বইয়ের মত মনে হইতেছিল। যেন বাতাসের বেগে বইখানার পাতার পর পাতা পরিবর্তিত হইয়া চলিয়াছে—মেঘ, পাহাড়, নদী, ক্ষেত, গাছ, নগর, গ্রাম, রেল-লাইনের পাশের পথের পথিক, মাঠের উপর দণ্ডায়মান বিস্মিতনেত্র উলঙ্গ শিশু, অবগুণ্ঠন খসিয়া পড়া পল্লীবধূ, গরু,. মহিষ, টেলিগ্রাফের তারের উপর পুচ্ছ দোলাইয়া নৃত্যরত ফিঙে পাখী—আমার নিবিষ্ট চিত্তের কাছে ভিন্ন ভাষার পুস্তকের মত নিতান্ত অর্থহীন হইয়া পড়িয়াছিল। গাড়ি ছুটিয়া চলিয়াছে উন্মত্তের মত। দেশের পর দেশ পার হইয়া চলিয়াছি, নদীর ব্রীজের উপর গাড়ির শব্দে মাঝে মাঝে চকিতের মত চিত্ত সজাগ হইয়া উঠে, গাড়ি ব্রীজ পার হইয়া যায়, শব্দ কমিয়া আসে, মন আবার চিন্তায় ডুবিয়া যায়।

অকস্মাৎ ঝলকে ঝলকে মিষ্ট গন্ধে আমার নিশ্বাস ভরিয়া বুক চঞ্চল হইয়া উঠিল। চিত্তের ধ্যান ভাঙিয়া গেল—সম্পূর্ণরূপে ভাঙিয়া গেল। দেখিলাম, ট্রেন চলিয়াছে বনভূমির বুক চিরিয়া। লাইনের দুই পাশে রক্তিম ঘন অরণ্য। মনে পড়িল, এটা ফাল্গুনের শেষ, অরণ্যভূমে বসন্ত দেখা দিয়াছে। শালের শাখায় শাখায় সুরক্তিম কিশলয়ে সৃষ্টির পূর্বরাগ ফুটিয়া উঠিয়াছে। কোথাও কোথাও ফুলও দেখা দিয়াছে। মুগ্ধ হইয়া চাহিয়া ছিলাম। ট্রেন আসিয়া থামিল হাজারিবাগ রোডে।

আবার ট্রেন চলিল। অরণ্যের গভীরতা ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল; কিন্তু শোভা কমে নাই, যেন বাড়িতেছে। শালের সঙ্গে পলাশ দেখা দিল। রাঙা রং গভীর হইয়া উঠিল। পত্ররিক্ত তরুর শাখা-প্রশাখার প্রান্তে প্রান্তে স্তবকে স্তবকে রাঙা রং যেন জমাট বাঁধিয়া আছে। ধানবাদের পর লাইনের পাশে পাশে কলিয়ারিগুলি পিছনের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। সহসা নজরে পড়িল সুবিস্তীর্ণ কারখানা, ট্রেনের মধ্য হইতেই টিনশেডের গায়ে লেখা নাম বেশ পড়া যাইতেছিল—চন্দ্রপুরা ফায়ার-ব্রিক্‌স। আপনা হইতেই জানলা হইতে দেহ বাহির করিয়া খানিকটা ঝুঁকিয়া পড়িলাম। মিনিট-খানেকের মধ্যেই সে ভূখণ্ড পিছনে পড়িয়া গেল, সম্মুখে নাচিতেছিল পলাশ ও শাল তরুর শাখাপ্রান্তাবলম্বী গভীর রক্তরাঙা বসন্তশোভা।

মনে পড়িয়া গেল মীরার নিমন্ত্রণের কথা। বসন্ত দেখিবার জন্য সে আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল। গাড়ি আসিয়া থামিল আসানসোলে। আসানসোলে নামিয়া আবার ফিরিলাম, আজ এই অনুরাগময় বসন্তের এমন একটি লগ্নক্ষণে মীরার মত সুন্দরীর নিমন্ত্রণ হেলা করিতে পারিলাম না।

চন্দ্রপুরায় আসিয়া চন্দ্রনাথই চোখের উপর ভাসিয়া উঠিল।

চিমনি, চিমনি, অসংখ্য সারি সারি চিমনি, আর সেই চিমনির উদ্গীরিত ধোঁয়ায় আকাশ আবৃত হইয়া গিয়াছে। তাহার শক্তি, তাহার দুর্বার আকাঙ্ক্ষার ছবি উষার প্রান্তরের পটভূমির উপর রূপ গ্রহণ করিয়া উঠিয়াছে। এখনও ছবি শেষ হয় নাই। প্রান্তরের পর প্রান্তরে সে প্রাথমিক রঙের ছোপ বুলাইয়া চলিয়াছে। দুই মাইল, চার মাইল, দশ মাইল, দশ বৎসর পরে কত মাইল ব্যাপিয়া যে তাহার আকাঙ্ক্ষা এ তুলিকা বুলাইয়া চলিবে, সে-ই কি তাহা জানে! 'গ্রোথ অব দি সয়েলে'র নব সংস্করণ রচনা করিয়াছে সে!

মাইলের পর মাইল অতিক্রম করিতে করিতে যদি তাহার আয়ু ও শক্তিতে কুলাইয়া এই বিস্তীর্ণ পৃথিবীকেই তাহার যন্ত্ররাজ্যে পরিণত করিতে পারে—তারপর? তারপর সে কি করিবে? মনে মনে ইচ্ছা হইল, তাহাকে এই প্রশ্ন একবার করিব, তারপর?

জানি, চন্দ্রনাথ হাসিবে, অট্টহাস্যে স্থানটা মুখরিত করিয়া তুলিবে। কিন্তু তবুও প্রশ্ন করিব।

পথটা এবার দেখিলাম, রাজপথের মত প্রশস্ত এবং সুন্দর হইয়াছে। পথের এক পাশে সারি সারি বাংলো উঠিয়াছে, একটার ফটকে লেখা—ম্যানেজার, ফায়ার-ব্রিক্স; অন্যটায় লেখা—এঞ্জিনীয়ার; আর একটায় লেখা—ম্যানেজার, আয়রন-ওয়ার্কস। আরও একটু দূরে সারি সারি ছোট ছোট কোয়ার্টার্স, বোধ হয় ভদ্র কর্মচারীদের জন্য নির্মিত হইয়াছে। আরও একটু অগ্রসর হইয়া দেখিলাম, বাজার হাট, সারি সারি দোকানে নানাবিধ পণ্য। আরও একটু অগ্রসর হইতেই সম্মুখে লোহার প্লেটে লেখা সাইন্‌বোর্ড চোখে পড়িল—সাবধান, রেল-লাইন। ইংরাজীতে লেখা। রেল-লাইনও কারখানার ভিতরে চলিয়া গিয়াছে। আরও অগ্রসর হইয়া দেখিলাম, দূরে শ্রমিকদের বসতি। পাথরের বুক ফাটাইয়া সেখানে জলভরা পুকুর টলমল করিতেছে। পথের দুই ধারে ছায়াঘন পল্লবিত তরুশ্রেণী। একটা গাছের তলায় দাঁড়াইয়া আবার একবার সমস্ত দেখিলাম, সহস্র ভ্রমরগুঞ্জনশব্দে মন ফিরিল, উপরের দিকে চোখ তুলিয়া চাহিলাম, দেখিলাম, গুলঞ্চ ফুলের গাছটি ফুলে ভরিয়া উঠিয়াছে। আর কারখানা দেখিতে ইচ্ছা হইল না, অগ্রসর হইলাম। পরিচিত বাংলোটার ফটকে এবার বিনা বাধায় প্রবেশ করিতে পারিলাম না। দুয়ারে গুর্খা পাহারা। সে কার্ড চাহিল, হাসিয়া কাগজে নাম লিখিয়া দিলাম।

কিছুক্ষণ পরই মীরা বাহির হইয়া আসিল। তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলাম, মীরা দেবী, আপনি আমাকে বসন্তশোভা দেখতে নিমন্ত্রণ করেছিলেন—

আমাকে কথা শেষ করিতে না দিয়াই স্মিত বিস্ময়ে উচ্ছ্বসিত পুলকে সে বলিয়া উঠিল, দোস্ত্!

কিন্তু দৃষ্টি উজ্জ্বলতর, প্রখর বলিয়া বোধ হইল; দেহের দীপ্তি যেন ভস্মযুক্ত লাবণ্যের মত ঝলমল করিতেছে। চঞ্চল লঘু পদে সে আমার দিকে অগ্রসর হইয়া আসিল। আমার দুইটি হাত ধরিয়া তাহার মাতৃভাষায় বলিল, তাহার গরিবখানা আজ আমার পদধূলিস্পর্শে ধন্য হইয়া গেল।

হাসিয়া বলিলাম, একি, বাংলা ভাষা আবার ছাড়লেন কবে থেকে!

মীরা সবিস্ময়ে আমার দিকে চাহিয়া রহিল।

আমি আবার ডাকিলাম, মীরা দেবী!

মীরা ম্লান-হাসি হাসিয়া বাংলাতে এবার বলিল, দেখুন, দেশের কথা ভাবছিলাম, বেরিয়ে এসেও কেমন মনে হ'ল, আমার কোন দেশোয়ালী বন্ধু—বাল্যজীবনের সখার সঙ্গে কথা কইছি।

তারপর তাহার স্বাভাবিক শান্ত-স্বরে বলিল, আসুন, এই অবেলায় খাওয়া-দাওয়া তো হয়নি আপনার?

বলিলাম, পাঁচ-বৎসর পূর্বে তুমি নিমন্ত্রণ করেছিলে বসন্তশোভা দেখবার জন্যে। বেলা প'ড়ে যাবে ভয়েই তো তাড়াতাড়ি আসছি, তবুও দেখ, বেলা প'ড়ে গেল।

অসঙ্কোচে কেমন 'তুমি' বলিয়া ফেলিলাম আজ।

মীরা হাসিয়া বলিল, বেশ তো, সন্ধ্যামণি ফুল তো ফুটবে, সেই ফুলের শোভাই শুধু দেখে যাবে দোস্ত্।

সেও আমাকে আজ 'তুমি' সম্বোধন করিল।

শান্ত মৃদু পদক্ষেপে সে অগ্রসর হইয়া চলিতেছিল।

স্নান সারিয়া ঘরে ঢুকিয়া দেখিলাম, মীরা খাবার লইয়া বসিয়া আছে। তাহার চোখ আবার দেখিলাম, সেই প্রখর স্বপ্নাতুর দৃষ্টি। সে আপন মনে মৃদু মৃদু হাসিতেছিল, আমি বলিলাম, কি রকম, হাসছ যে, হঠাৎ কি মনে প'ড়ে গেল?

মীরা বলিল, ভাবছিলাম, ফতেপুরসিক্রির মেলার কথা। এক বিদেশী তরুণ ফকির, সে যে কি অপরাধীর মত ভঙ্গিতে এসে দাঁড়াল, উঃ, মুখে কথা ফোটে না!—বলিয়া সে খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। মীরার এমন সরল চঞ্চল হাসি তো কখনও শুনি নাই!

তখনও সে বলিতেছিল, কিন্তু কত দরদ সে ফকিরের, যার একগাছা তুচ্ছ লাঠি, অতি তুচ্ছ তার কিস্মৎ, উঃ!

কৌতুকোজ্জ্বল মুখদীপ্তি পরিবর্তিত হইয়া বিপুল বিস্ময়ে শ্রদ্ধায় স্মিত ধ্যানমগ্নার মত পবিত্র সুন্দর হইয়া উঠিল, আমি তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া ভাবিতেছিলাম, একি, মীরা প্রকৃতিস্থ তো?

অবশেষে প্রশ্ন করিলাম, খোকা কেমন আছে, আপনার খোকা?

মীরা আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, জিঞ্জিরের কথা বলছেন? হ্যাঁ, সে ভাল আছে, সে স্কুলে থাকে।

আমি চকিত হইয়া বলিলাম, তা হ'লে আবার নবীন আগন্তুক কেউ এসেছে ব'লে মনে হচ্ছে। সত্যি? কেমন আছে সে?

মীরা আমার প্রশ্নের মর্মার্থ বুঝিয়াছিল, সে হাসিয়া বলিল, দেখবেন তাকে? এ বুবুয়া আমার বড় ভাল। এই আমার কুমারকিশোর, শৈশব-লাবণ্যের ক্ষয় নেই এর, দেখবেন?

সে আনন্দিত চঞ্চল ভঙ্গিতে উঠিয়া গেল। মীরার প্রসন্নতার হেতু বুঝিলাম, তাহার শান্ত বিষণ্ণতার জন্য আমার একটা গোপন বেদনা ছিল, সে বেদনা আজ মুহূর্তে অপসারিত হইয়া গেল। বহুদিন পূর্বের একটা কথা মনে পড়িল, রবিশস্যের ক্ষেত্র দেখিয়া কথাটা মনে হইয়াছিল। ভাবিলাম, যে বীজ হইতে তাহার নবজন্ম হইবে সে আসিয়াছে।

পর্দা ঠেলিয়া মীরা ঘরে প্রবেশ করিল, তাহার কোলে গোলাপের মত শিশু—কোমল, উজ্জ্বল, সুন্দর, নীলাভ দুইটি চোখ; কিন্তু একি! এ যে পুতুল!

মীরা বলিল, এ আমার বড় হবে না, কেমন বলুন তো?

আমার চোখে জল আসিয়া গেল, রোধ করিতে পারিলাম না।

মীরা চেয়ারে বসিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, আপনার চোখে জল? কিন্তু কি জানি দোস্ত, আমার কেমন বালিকা-বয়সের মত পুতুল খেলতে সাধ গেল!

আমি নির্বাক হইয়া ভাবিতেছিলাম, সেই মীরা!

মীরা বলিল, নিন, শিগ্‌গির খেয়ে নিন, আজ বেড়াতে যাব। আমি পোশাকটা পাল্টে আসি।

সে চলিয়া গেল। আমি মীরার কথাই ভাবিতেছিলাম। কিছুক্ষণ পর মীরা বাহির হইয়া আসিল। পরনে তাহার রাঙা-শাড়ি, বহুমূল্য গাঢ় লাল-রঙে বেনারসী শাড়ি, দুইটি ভ্রূর মধ্যে লাল সিঁদুরের টিপ।

আমি মুগ্ধ হইয়া দেখিতেছিলাম।

মীরা বলিল, বনে আগুন লেগেছে বসন্তশোভায়, আমিও আগুনের মত ভূষায় নিজেকে সাজালাম। কিন্তু সে বিদেশী ফকিরকে দেখাতে পেলাম না।

সে চিন্তামগ্ন হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

আমি বলিলাম, চলুন।

চকিত হইয়া সে বলিল, অ্যাঁ? হ্যাঁ, চলুন।

পনেরো

প্রান্তরের বুকের উপর পথিকের রচনা করা পথ।

দুই ধারে স্বল্পঘন পলাশ, শাল ও মহুয়ার গাছ। শালের গাছে রাঙা কচি পাতা, পলাশের গাছগুলি গভীর রক্তবর্ণ ফুলে আচ্ছন্ন, পত্রহীন মহুয়ার শাখাপ্রান্তে ফুলের স্তবক। শালের গাছেও কোথাও কোথাও ফুল দেখা দিয়াছে। মহুয়ার উগ্র গন্ধের মধ্যেও শাল-ফুলের হৃদ্য মিষ্ট গন্ধ পাওয়া যায়। ওপারের বনে, দূরত্ব হেতু যেখানে গাছে গাছে মেশামেশি হইয়া গিয়াছে, সেখানে যেন আগুনের খেলা চলিয়াছে। বাতাসে গাছ দোলে, মনে হয়, আগুন নাচে। পথে একটি সাঁওতালদের পল্লী, ছোট ছোট ছবির মত ঘরগুলির নিজস্ব একটি এমন সৌন্দর্য আছে যে, মন কাড়িয়া লয়। খানিকটা দাঁড়াইয়া দেখিতে হইল। চারদিকে খড়িমাটি দিয়া নিকানো, নীচের বনিয়াদটুকু মনে হয় যেন সিমেণ্টে গড়িয়া তুলিয়াছে। সেটুকুর রং ঠিক সিমেণ্টের মত। দেখিলাম, গোবর ও মাটি দিয়া নিকানো।

পল্লী পার হইয়া চলিলাম। বন ঘন হইয়া উঠিতেছিল। প্রান্তরের বুক ঢাকিয়া শুধু শাল ও পলাশের চারা। তাহার পর আরম্ভ হইল পাথর, পাথরের পর পাথর সাজাইয়া কে যেন সিঁড়ি কাটিয়া রাখিয়াছে।

মীরা বলিয়া উঠিল, উঃ, রক্ত!

সত্যই একটা শালগাছের গোড়াটা রক্তাক্ত হইয়া আছে, গাছটার গা বাহিয়াও রক্ত ঝরিতেছে।

বলিলাম, রক্ত নয়, গাছের আঠা।

মীরা বলিল, না, গাছের রক্ত।

আমি আঠার প্রবাহটায় হাত দিয়া দেখিলাম, পুরাতন ক্ষত। আঠার ধারাও শুকাইয়া গিয়াছে। মীরাও স্পর্শ করিয়া দেখিতেছিল, সহসা তাহার কি খেয়াল হইল, সে নখ দিয়া খুঁটিয়া খুঁটিয়া আঠা ছাড়াইতে আরম্ভ করিল।

প্রশ্ন করিলাম, কি হবে?

আঠা ছাড়াইতে ছাড়াইতেই মীরা উত্তর দিল, টিপ পরব। সিঁদুর এত উজ্জ্বল নয়।

খানিকটা আঠা সে আপনার বহুমূল্য শাড়ির আঁচলের খুঁটে বাঁধিয়া লইল।

আমি হাসিলাম, বলিলাম, অদ্ভুত নারীর মন!

কেন বলুন তো?

তোমার ওই আঁচলের কোণটুকুর দাম আর ওই আঠাটুকুর দাম তুলনা ক'রে দেখ দেখি।

মীরা হাসিয়া বলিল, জলুস দেখেই তো আমরা চিরদিন ভুলে আসছি দোস্ত, কিন্তু যাচাই করবার অবকাশ তো কোন দিন পাইনি।

তাহার উত্তর শুনিয়া আশ্বস্ত হইলাম, মীরার উত্তরের মধ্যে অস্বাভাবিক তো কিছু নাই।

নদীর তটভূমির উপর দাঁড়াইয়া বিস্ময়ে আনন্দে স্তব্ধ হইয়া গেলাম। তীরের উপরই দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলাম। অপূর্ব রূপ নদীর! ওপারের ছোট পাহাড়টা যেন বাহু প্রসারিত করিয়া নদীকে সবলে আপন বক্ষলীনা করিয়াছে। পাহাড়ের ছোট একটা শাখা নদীর বুকে বাঁধ দিয়া এপার পর্যন্ত প্রসারিত। নদী কিন্তু বাধা মানে নাই, সে পাহাড়ের সাদর-প্রসারিত বুক চিরিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। দুই ধারের তটভূমি খাড়া সোজা, পাথর দিয়া বাঁধানো। পাথরের ফাটল হইতে জন্মিয়াছে অজস্র কুটজকুসুমের গাছ। গাছগুলি অবনতমুখী হইয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে, বৃন্তে তাহার পুষ্পকলির স্তবক, পাহাড় যেন নদীর কেশে ফুল পরাইয়া দিতেছে।

বসন্তের শীর্ণ নদীর বুকের মধ্যে পাহাড়ের দীর্ঘ বক্ষ জাগিয়া উঠিয়াছে। সে যেন পাথরের বাঁধানো একখানি অঙ্গন। কিসের ঝরঝর শব্দে জনহীন নদীবক্ষ অরণ্যভূমি মুখরিত।

মীরার মুখের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিলাম, কিসের শব্দ?

সে একটা শালগাছের কিশলয়প্রান্ত ভাঙিয়া চুলে পরিতেছিল, বলিল, আসুন দেখবেন আসুন, জলপ্রপাতের শব্দ।

পাথরে পাথরে হরিণীর মত লাফ দিয়া সে নদীর বুকে নামিয়া পড়িল, আমিও নামিয়া পড়িলাম। নদীর বক্ষে দাঁড়াইয়া দেখিলাম নদীর আর এক রূপ। সম্মুখে শুধুই পাথর আর পাথর। পাথরের বুকে শত শত রন্ধ্র, অসংখ্য আঁকা-বাঁকা লেখা-জোখা—নদী ও পাহাড়ের দ্বন্দ্বযুদ্ধের ইতিহাস। আর একটু আসিয়া দেখিলাম, এক পাশে পাহাড়ের বুক গভীরভাবে চিরিয়া পয়োনালী বাহিয়া নদীর জলধারা ঝরঝর শব্দে তিন চারি দিক দিয়া দশ-বারো ফুট নীচে পাহাড়ের বুকে রচা একটা হ্রদের মত গহ্বরে ঝরিয়া পড়িতেছে। সেখান হইতে সম্মুখের আর একটা প্রস্তর-অঙ্গন চিরিয়া আবার নীচের হ্রদে গিয়া পড়িতেছে। তাহার পর আবার একটায়—নদী ধাপে ধাপে যেন পাহাড়ের পঞ্জরাস্থির একটির পর একটি অতিক্রম করিয়া চলিয়া গিয়াছে।

মীরা ডাকিল, এখানে আসুন।

দেখিলাম, মীরা একেবারে হ্রদের ধারে গিয়া পা ঝুলাইয়া বসিয়াছে। অপরূপ পারিপার্শ্বিকের মধ্যে অপূর্ব শোভনরূপে পরিস্থিতা মীরার সে ছবি আমি জীবনে ভুলিব না। হ্রদের বুক হইতে জলপ্রপাতের বেগে ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত শীকরকণা কুয়াশার মত তাহাকে ছাইয়া ফেলিয়াছে। সম্মুখের দিগন্তের তির্যক রশ্মির প্রতিভাতিতে রামধনুর সপ্তবর্ণচ্ছটা মীরার মুখের উপর। পিছনে তাহার ওপারের বসন্তপুলকিত বনভূমি। রহস্যময়ী মীরা আজ যেন যথার্থরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। মনে মনে আক্ষেপ হইল, কেন আমি চিত্রশিল্পী নই?

মীরার পাশে গিয়া বসিলাম। মীরা গভীর মনোযোগের সহিত জলপ্রপাতের রূপ দেখিতেছিল আর কল্লোল-ধ্বনি শুনিতেছিল। আমিও প্রকৃতির শোভার মধ্যে ডুবিয়া গেলাম।

মীরা বলিল, নদী নাচছে দেখছেন, শুনছেন তার ঘুঙুরের শব্দ? ঠিক তালে তালে নাচছে। দেখবেন, তাল দোব, কেমন মিলে যাবে?

সে হাতে একটি তালি দিল। আমি দ্বিতীয় তালের প্রতীক্ষায় তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম।

মীরা বলিল, দ্বিতীয় তাল তো এখন পড়বে না। এমনই ধারা উৎকর্ণ হয়ে দিবারাত্রি শুনতে হবে, একাগ্র হয়ে দেখতে হবে, তবে সে সময়টি ধরা যাবে।

আমি কি বলিতে গেলাম। মীরা আমার হাত ধরিয়া বাধা দিয়া বলিল, চুপ ক'রে শুনুন। বুঝতে পারছেন, ঠিক একেবারে মিলে যাচ্ছে ?

আবার আমার মনে চিন্তা জাগিয়া উঠিল, মীরা কি প্রকৃতিস্থ ? মীরাকেই লক্ষ্য করিতেছিলাম। কিছুক্ষণ পরে সম্মুখের পাথরের উপর দুইটি ছায়া সুস্পষ্ট হইয়া জাগিয়া উঠিল।

দেখিলাম, বনের মাথায় চাঁদ উঠিয়াছে। বলিলাম, চল মীরা, আর নয়, রাত্রি হয়ে গেছে। আকাশে চাঁদ উঠেছে।

মীরা আকাশে মুখ তুলিয়া চাঁদের দিকে চাহিল। তারপর চাহিল নীচে জলপ্রপাতের ধারার দিকে। চাঁদ যেন সে ধারার মধ্যে গুঁড়া হইয়া মিশিয়া গিয়াছে।

আমি বলিলাম, চল মীরা।

মীরা বলিল, যাব ?

সে ধীরে ধীরে উঠিল। আমি আগে আগে চলিয়াছিলাম ; মীরা নীরবে আমায় অনুসরণ করিয়া আসিতেছিল। দূরে সাঁওতালদের পল্লীতে মাদল ও বাঁশী বাজিতেছে, তাহার সঙ্গে নারীকণ্ঠের সমবেত সুরের গান ভাসিয়া আসিতেছে।

পল্লীটার প্রবেশমুখে পিছন ফিরিয়া বলিলাম, একটু এদের উৎসব দেখা যাক, কি বল ?

কিন্তু একি, মীরা কই ? বেশ ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, প্রান্তর জনশূন্য। মীরা কই ? ডাকিলাম, মীরা ! মীরা !

কোন উত্তর পাইলাম না। চিন্তিত হইয়া ফিরিলাম, পথেও কোথাও মীরা নাই। নদীর কাছে আসিয়া শরীর শিহরিয়া উঠিল। জলপ্রপাতের ঝরঝর শব্দের সঙ্গে খিলখিল হাসি। পাথরে পাথরে সে হাসি হাজারখানা হইয়া বাজিয়া ফিরিতেছে।

আবার হাসি। মীরাই তো বটে। আজই তো তাহার সরল হাসি শুনিয়াছি। সেই ঝঙ্কারই প্রতিধ্বনিত হইয়া কানে বাজিতেছে। সাধ্যমত দ্রুতপদে নদীর তটপ্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইলাম। চাঁদের আলোয় নদীগর্ভের পাথর ও জল ঝলমল করিতেছে। মীরা সন্ধ্যার সেই পাথরখানার উপর বসিয়া নীচের দিকে ঝুঁকিয়া থাকিয়া থাকিয়া খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিয়া প্রতিধ্বনির শব্দ কান পাতিয়া শুনিতেছে। যেন জলপ্রপাতের সুরের সহিত মিলাইয়া দেখিতেছে।

আমি ডাকিতে গেলাম, মীরা !

কিন্তু নিরস্ত হইলাম, যদি আকস্মিক আহ্বানে চকিত হইয়া নীচে পড়িয়া যায় ! সম্মুখেও অগ্রসর হইতে ভয় হইতেছিল, যদি মানুষ দেখিয়া সে চমকিয়া উঠে ! কি করিব ভাবিতেছিলাম। এই সময় আমাকে আশ্বস্ত করিয়া মীরা উঠিল। দেখিলাম, ফুলের স্তবক ভাঙিয়া সে নিজেকে সাজাইয়াছে। চুলে ফুল গোঁজা, কানেও ফুলের সজ্জা। পাথরের চত্বরটার উপর আসিয়া সে দাঁড়াইল, তারপর হাত দুইটি লীলায়িত ভঙ্গিতে প্রসারিত করিয়া দিয়া সে দুলিয়া উঠিল। একি, মীরা নাচিতেছে !

মীরার সে কি নৃত্য ! সমস্ত প্রস্তর-চত্বরটায় প্রজাপতির মত লঘু গতিতে সে নাচিয়া নাচিয়া

নাচিয়া ফিরিতেছিল। নাচিয়া ফিরিতে ফিরিতে সে এক স্থানে দাঁড়াইয়া পাক দিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিতে আরম্ভ করিল। নৃত্য-ঘূর্ণনের বেগে মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিলুপ্ত হইয়া গেল, পরনের শাড়ি ফুলিয়া উঠিল, সল্‌মা-চুমকির কাজগুলি চাঁদের আলোর প্রতিবিম্বে ঝকমক করিতেছিল; এও যেন আর একটা রঙিন জলপ্রপাত। আজও মনে হয়, সেদিন মীরার পায়ে নূপুর থাকিলে জলকল্লোল হয়তো লজ্জায় স্তব্ধ হইয়া যাইত। সেই রাত্রেও বনমধ্যে কোন কাঠুরিয়া কাঠ কাটিতেছিল। তাহার আঘাত শুনিতে শুনিতে যেন তাল পড়িতেছিল।

আমি ভাবিতেছিলাম, একি, এত দীর্ঘ দিনের জীবনোচ্ছ্বাস কি আজ নীরবে মীরার বুক ফাটিয়া বাহির হইয়া গেল? চোখ দিয়া আমার জল আসিল।

রাত্রি বাড়িতেছিল।

মীরা নৃত্য থামাইয়া ক্লান্ত হইয়া পাথরের উপর বসিয়া পড়িল। আকাশের চাঁদের দিকে তাহার দৃষ্টি। আমি এবার ধীরে ধীরে নিকটে গিয়া তাহাকে ডাকিলাম, মীরা দেবী, মীরা!

চাঁদের আলোর প্রতিভাতিতে চোখ তাহার ঝকমক করিতেছিল। সে খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

আমি তাহার হাত ধরিয়া আকর্ষণ করিয়া বলিলাম, বাড়ি আসুন, চন্দ্রনাথ ডাকছে।

মীরা বলিল, গান শুনবেন দোস্ত্‌?

বলিলাম, বাড়িতে গান শুনব, আসুন।

দৃঢ় মুষ্টিতে তাহার হাত ধরিয়া আকর্ষণ করিলাম।

চন্দ্রনাথ তখনও আসে নাই। আয়াকে ডাকিয়া বলিলাম, মেমসাহেবের শরীর অসুস্থ, ওঁকে শুইয়ে দিয়ে মাথায় হাওয়া কর।

গভীর রাত্রে একটা শব্দে আমার ঘুম ভাঙিয়া গেল, মন উৎকণ্ঠিত হইয়াই ছিল। চাঁদ তখন অস্তে চলিয়াছে, তবুও সেই মরা জ্যোৎস্নার আলোতেই দেখিলাম, বিস্রস্তবাসা মীরা বাগানের শিশিরসিক্ত ঘাসের উপর মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে।

পরদিন প্রাতে চন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা হইল। মীরা তখনও ঘুমাইতেছিল। তাহাকে বলিলাম, আমাকে আজ সকালের ট্রেনেই ফিরতে হবে। কিন্তু মীরার শরীর যে বড় খারাপ!

চন্দ্রনাথ বলিল, সে আমি লক্ষ্য করেছি। মাথা বোধ হয় খারাপ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমি হেল্‌পলেস্‌, আমাকে সব বেচে ফেলতে হবে, এখন এক মুহূর্ত অবসর নেই।

আমি চমকিয়া উঠিলাম, সেকি?

চন্দ্রনাথ বলিল, সেই মাড়োয়ারী নালিশ করেছেন, রাশীকৃত টাকা তাঁর পাওনা হয়েছে, কয়েক লাখ, আমাকে এখন অন্য চান্স দেখতে হবে।

আমি প্রশ্ন করিলাম, কোন উপায় নেই?

উকিল বলেন, অনেক উপায় আছে, এবং তাতে নিশ্চিত নাকি ফল হবে। অন্তত কম্প্রোমাইজ করতে বাধ্য হবে। কিন্তু সে আমি কেমন ক'রে বলব? ওরা বলে, বলুন—শেয়ার কেনবার জন্যে ও টাকা দিয়েছিল, ও লেখাপড়া সাময়িকভাবে হয়েছে, এমনই অনেক কিছু। কিন্তু সে আমি কেমন ক'রে বলব? দোষ তো আমার, সুদটা দিয়ে গেলে—। যাকগে, তোর ট্রেনের কিন্তু আর সময় নেই।

আমার বেদনার আর সীমা ছিল না। আমি বলিলাম, কিন্তু চন্দ্রনাথ—

চন্দ্রনাথ ঘড়ি দেখিয়া দারোয়ানকে বলিল, জলদি মোটর আনতে বল।

আমি বলিলাম, দেখ, মীরা সম্পূর্ণ পাগল হয়ে গেছে বলে আমার মনে হয়।

বাধা দিয়া চন্দ্রনাথ বলিল, কি করব আমি ? আমার জীবন যে এখনও সম্পূর্ণ অসম্পূর্ণ। আমার আবার নতুন ক'রে আরম্ভ করতে হবে সব।

অকস্মাৎ তাহার বড় বড় চোখ দুইটি জলে ভরিয়া উঠিল। সে বলিল, আমার দিকে কেউ চেয়ে দেখলি নি তোরা, শুধু আমাকে অপরাধীই ক'রে গেলি।

মোটরটা সশব্দে আসিয়া ফটকের সম্মুখে থামিল।

কলিকাতায় ফিরিয়াই চন্দ্রনাথকে পত্র লিখিয়াছিলাম ; উত্তর পাইলাম না।

বেশ মনে আছে, ট্রেনে উঠিয়া চোখে জল আসিয়াছিল। চন্দ্রনাথের জন্য নয়, মীরার জন্য। • চন্দ্রনাথ হয়তো আবার উঠিবে, কালপুরুষ যদি অস্ত যায়, তবে সে আবার দেখা দিবে ! কিন্তু অরুন্ধতী ?

মনে মনে সেদিন ভুল স্বীকার করিয়াছিলাম, মনোমধ্যের মীরাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলাম, তুমি অরুন্ধতী নও, তুমি অরুন্ধতী নও, রক্তমাংসের নিতান্ত মানবী তুমি, শ্রদ্ধান্বিত অন্তরের নমস্কার তোমার প্রাপ্য নয়, তাই তোমার জন্য চোখে জল আসিল।

কোন উপায় কি নাই ? কোন উপায় নাই ? সেদিন সন্ধ্যায় আকাশপানে চাহিয়া মনে পড়িল হীরুকে। যাইব, হীরুর কাছেই যাইব।

ষোল

হীরুর অর্থে চন্দ্রনাথের উপকার হয় না ? গতবার সাক্ষাতের সময়েও তো তাহাকে এ কথা বলিয়াছিলাম, তাহার উত্তরও মনে আছে। মনে হইল, না, যাইব না। ধনীর খেয়ালী দুলালের নিকট চন্দ্রনাথের প্রচেষ্টার কোনও মূল্য নাই। তাহার নিকট চন্দ্রনাথকে খাটো করিব না।

অপ্রকৃতিস্থা মীরা ও তাহার ছেলেকে মনে পড়িল। কেতাদুরস্ত ক্ষীণকায় উকিলবাবুটিকে মনে পড়িল, তাঁহার কথা যেন ট্রেনের গতিধ্বনির মধ্যে শুনিতেছি, এ আপনাকে পারতেই হবে, নইলে তাঁর সঙ্গে যে কত লোকের সর্বনাশ হবে ! সঙ্গে সঙ্গে আর একজনকে মনে পড়িয়া গেল—যাযাবরীকে।

মনের দিগন্তে দাঁড়াইয়া যাযাবরী যেন রহস্যের হাতছানি দিয়া ডাকিতেছিল।

আমি যাইব, হীরুকে ধরিয়া একবার দেখিব। যদি সে দান করিয়া বড়ই হইতে চায়, আমিই হাত পাতিয়া গ্রহণ করিয়া ছোটই হইব। যাযাবরীকে আর একবার দেখিব। কলিকাতায় আসিয়া আবার পরদিনই দেশে রওনা হইয়া গেলাম, হীরুর ঠিকানার জন্য। সেখানে গিয়া শুনিলাম, হীরু সাঁওতাল পরগণার মধ্যে তাহার জমিদারী কাছারিতে রহিয়াছে।

ম্যানেজার বলিল, কি যে করছেন মশায়, তিনিই জানেন। সেখানকার জমা-খরচ যা আসছে, তাতে তো দেখছি কার্টিজ, হুইস্কি, শিকারীর বকশিশ, শুধু এই।

ম্যানেজারটি হীরুদের বাড়ির পুরাতন লোক। তাহার বাপ-খুড়ার আমল হইতেই কাজ করিতেছে।

হুইস্কি, কার্টিজ ইত্যাদি খরচের জন্য বিরক্তি প্রকাশ করায় আমি বিস্মিত হই নাই। হাসিয়া তাহাকে উত্তর দিলাম, ধ'রে পেড়ে হীরুর বিয়ে দিতে পারেন কোন রকমে ?

বৃদ্ধ ম্যানেজার বলিল, নরুবাবু, হাতে ক'রে যাকে মানুষ করলাম, এমন সুন্দর চেহারা, যাকে দেখে ভালোবাসতে ইচ্ছে করে, মনে হয় ফুলের মত নরম ছেলে, সে ছেলে যে এতখানি শক্ত, এমন একগুঁয়ে হয়, আমি জানতাম না। আমি নিরুপায়, মনিবের বংশের সব শেষ দেখেই বোধ হয় আমাকে যেতে হবে।

কৌতূহলের চেয়ে প্রবল প্রবৃত্তি বোধ হয় মানুষের আর নাই। মানবজীবনে ক্ষুধা-তৃষ্ণার পরেই এই প্রবৃত্তির বিকাশ। যে জিনিস তাহার অজানা, তাহা জানিবার প্রবৃত্তি অনেক ক্ষেত্রে ভদ্রতা ও শীলতার বিধানে হয়তো নিন্দনীয়, কিন্তু অস্বাভাবিক নয়। সহসা আমি জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলাম, হীরু কি টাকাকড়ি অনেক অপব্যয় ক'রে ফেললে ?

ম্লান হাসি হাসিয়া ম্যানেজার বলিল, সে হ'লেও তো জানতাম, যাক, আমার মনিবের বংশই সব ভোগ ক'রে গেল। নরুবাবু, অদ্ভুত ভাগ্য আমার হীরুবাবুর ! জান তো, খুড়ো, ভাই, মামা—

বাধা দিয়া বলিলাম, জানি।

ম্যানেজার বলিল, সব জান না ; সে সব তো পেয়েছেই, আবার সেদিন, হীরুবাবুর বাপের এক মামী মারা গেছেন, তিনিও তাঁর সব দিয়ে গেছেন হীরুবাবুকে।

মৃত্যু-দেবতার অনুগৃহীত হতভাগ্য হীরুকে স্মরণ করিয়া ব্যথিত না হইয়া পারিলাম না।

বহুক্ষণ নীরবেই রহিলাম। চিন্তা কিছু করিয়াছিলাম বলিয়া মনে পড়ে না ; একটা দ্বিধায় পড়িয়া বোধ হয় নীরব হইয়াই ছিলাম। ক্ষণে ক্ষণে মনে পড়িতেছিল যাযাবরীকে। তাহার কথা এই বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিতে কেমন সঙ্কোচ হইল, জিজ্ঞাসা করিলাম না।

হীরুদের বাড়ি হইতে বাহির হইয়া আসিয়া মনে পড়িল বউদিদিকে। স্নেহময়ী বউদিদির চরণে প্রণাম জানাইয়া না গেলে আমার অপরাধের সীমা থাকিবে না। আরও ভাবিলাম, নিশানাথবাবুকে একবার ধরিয়া দেখিব, তিনি যদি চন্দ্রনাথের কাছে যাইয়া অনুরোধ করেন, তবে হয়তো চন্দ্রনাথ তাহার কথা শুনিতেও পারে। মামলা মোকদ্দমা করিলেও মাড়োয়ারী আপোস-মিটমাট করিতে বাধ্য হইবে।

আর যাই হোক, নিশানাথবাবু ধনাগমতৃষ্ণায় পাগল নন, তাঁহার ক্ষুধাকে আমি নমস্কার করি। বাড়ির সম্মুখে গিয়া আমার আর অগ্রসর হইতে পা উঠিল না।

একি, বাড়ির অবস্থা এমন হইয়াছে ! ঘরের চালে খড়ের আচ্ছাদন নাই বলিলেই হয়, চারিপাশের প্রাচীর-পরিবেষ্টনী ভূমিসাৎ হইয়া গিয়াছে, মাটির কোঠার বারান্দার রেলিংগুলি ভাঙিয়া পড়িয়াছে। দুইখানা অতি জীর্ণ মলিন শাড়ি রৌদ্রে শুকাইতেছিল, তাই বুঝিলাম, বউদিদি আমার বাঁচিয়া আছেন, নতুবা ঘরে প্রবেশ করিতেও আমার সাহস হইত না।

অপরাধীর মত ঘরে প্রবেশ করিয়া ডাকিলাম, বউদিদি !

চৌদ্দ-পনরো বৎসরের শীর্ণ একটি ছেলে বারান্দায় দাঁড়াইয়া ছিল, সে বলিল, কাকে খুঁজছেন ?

মুখ দেখিয়া অনুমান করিলাম যে নিশানাথবাবুর পুত্র। বলিলাম, তুমি নিশানাথবাবুর ছেলে ?

ইতিপূর্বে তাহাকে দেখিবার আমার সুযোগ হয় নাই। ঘাড় নাড়িয়া সে বলিল, হ্যাঁ।

তোমার বাবা কোথায় ? মা কোথা গেলেন ?

সে উত্তর দিল, বাবা বাড়িতে থাকেন না। মা কোথায় গেছেন, আসছেন। ডাকব তাঁকে, কি বলব বলুন ?

বলিলাম, বলবে নরু কাকা, আমি তোমার কাকা হই, নরেশ কাকা।

সে তাড়াতাড়ি আমাকে প্রণাম করিয়া সপ্রশংস দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, আপনিই লেখক নরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়? মা আপনার নাম প্রায়ই করেন।

আশ্চর্য মানুষের মন, ক্ষুদ্র একটি বালকের প্রশংসমান দৃষ্টি ও প্রশ্নে পুলকিত না হইয়া পারিলাম না। মুহূর্ত-পূর্বের চিত্তের বেদনা যেন দূরে চলিয়া গেল।

কে, নরু? এস ভাই, এস, কখন এলে?

বউদিদি আসিয়া বাড়িতে প্রবেশ করিলেন, তাঁহাকে দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলাম। এই সেই বউদিদি? আমার অন্নপূর্ণা, হৃষ্টপুষ্ট লাবণ্যময়ী শস্যপরিপূর্ণা বসুন্ধরার মত সেই নারী, এই হইয়াছে?

এ যে দারুণ অনাবৃষ্টির বিবর্ণ পাণ্ডুর নিষ্ফলা পৃথিবীর জীর্ণ শীর্ণ মূর্তি।

সঙ্গে সঙ্গে আর একজনকে মনে পড়িল, মীরাকে। দেহে নয় মনে, মীরাও এমনই দীনা মূর্তি।

বউদিদি বোধ হয় আমার মনের কথা অনুমান করিয়া লইলেন, ম্লান হাসি হাসিয়া বলিলেন, চিনতে কষ্ট হচ্ছে, না ভাই?

প্রণাম করিয়া বলিলাম, হ্যাঁ বউদি, চোখে আমার জল আসছে।

দাওয়ায় আমাকে বসাইয়া বউদিদি বলিলেন, আমার অদৃষ্ট ভাই, তুমি মিছে চোখের জল ফেলে করবে কি?

নীরবে নতশিরেই বসিয়া রহিলাম। কোন প্রশ্ন করিতে সঙ্কোচ হইতেছিল, পাছে অজ্ঞাতে কোন মর্মান্তিক ক্ষতস্থানে নতুন করিয়া আঘাত দিয়া ফেলি।

বউদিদি বলিলেন, তোমাদের দাদা সন্ন্যাসী হয়েছেন, জান তো?

আশ্চর্য হইয়া গেলাম, বলিলাম, সন্ন্যাসী!

ম্লান হাসি হাসিয়া বউদিদি বলিলেন, হ্যাঁ, সন্ন্যাসী। আজ তিন বৎসর হয়ে গেল। শ্মশানে কুঁড়ে বেঁধে সেখানে থাকেন, প্রথম প্রথম বাড়িতে আসতেন, আজ এক বছর আর বাড়িতেও আসেন না। এক বছর আজ অন্নও ত্যাগ করেছেন।

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া আবার বলিলেন, সংসার তো প্রত্যক্ষ বাস্তব রিপু; আপনার জন হ'ল এক ঈশ্বর; তাঁকে না পেলে মানব-জন্মের সার্থকতা কি?—কথাগুলো আমি মুখস্থ ক'রে রেখেছি ভাই।

আমি নির্বাক হইয়া ভাবিতেছিলাম।

বউদিদি আবার প্রশ্ন করিলেন, তুমি নাকি ঠাকুরপো চন্দ্রনাথের খবর জান? সে নাকি খুব বড়লোক হয়েছে?

বলিলাম, চন্দ্রনাথের বড় বিপদ বউদি। তার লক্ষ লক্ষ টাকা ঋণ হয়ে গেছে। সর্বস্বই বোধ হয় বিক্রি হয়ে যাবে।

বউদিদি সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, লক্ষ লক্ষ!

সে দৃষ্টি, সে বিস্ময়, সে কণ্ঠস্বর জীবনে আমি ভুলিব না।

তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, তার আর দোষ কি? সে তো আমার দেওর, স্বামীই যখন চোখে দেখলে না, তখন দেওরকে দোষ দোব কি?

আমি কেমন অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিতেছিলাম, যেন উঠিয়া আসিতে পারিলে বাঁচিয়া যাই।

নিশানাথবাবুকে কঠিন ভাষায় তিরস্কার করিবার প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিতেছিল, বলিলাম,

আমি একবার শ্মশানে যাব বউদি, তাঁকে দুটো কথা আমি জিজ্ঞাসা করব।

ম্লান হাসি হাসিয়া বউদিদি বলিলেন, মিথ্যাই জিজ্ঞাসা করবে ভাই। আর সত্যি বলতে দোষ তাঁরই বা কি? দোষ তো আমার ছেলেমেয়ের অদৃষ্টের, তিনি তো আপনার কাজ করছেন। অন্যায়ও কিছু করছেন না।

উত্তেজিত হইয়া বলিলাম, অন্যায় নয়? লক্ষবার আমি বলব, এ অন্যায়।

এ কথা ছাড় ভাই। তার চেয়ে ব'স একটু, তোমার সঙ্গে সুখদুঃখের কথা কই দুটো। উঃ, কত দিন তোমাকে দেখিনি! সেই সেবারে এসে নিরুর পাত্রের কথা ব'লে গিয়েছিলে, নিরু তখন বারো বছরের, আর এখন হ'ল উনিশ বছরের। তা হ'লে সাত বছর হ'ল, নয়?

লজ্জায় আমার মাটির সঙ্গে মিশিয়া যাইবার ইচ্ছা হইল। আপনার স্বার্থপরতার উপর অভিসম্পাত দিলাম।

বউদিদি আমার অবস্থা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, লজ্জা পেলে বুঝি? না না, তোমার লজ্জা কি? লজ্জা পাবে জানলে কথাটা আমি বলতাম না। একটু জল খাও ভাই, এই সামান্য একটু মিষ্টি—একটু গুড় আর এক গ্লাস জল। অন্নপূর্ণার দোরে এসে কি অভুক্ত যেতে আছে?—বলিয়া তিনি হাসিয়া উঠিলেন; আমার চোখ দিয়া কি ঝরঝর করিয়া জল ঝরিয়া পড়িল! বউদিদি সস্নেহে তাঁহার আঁচল দিয়া আমার চোখ মুছাইয়া দিয়া বলিলেন, না না, কেঁদো না ভাই, কি করবে কেঁদে?

মনে একটা সংকল্প জাগিয়া উঠিল, বলিলাম, নিরুর বিয়ে কি আজও হয়নি?

বউদিদি বলিলেন, বিয়ে? বিষ কি দড়ি কিনে দেবার পয়সাই জুটল না।

অকুন্ঠিত কণ্ঠে বলিলাম, সেবার আপনি আমাকে বিয়ে করতে অনুরোধ করেছিলেন, এবার আমি আপনাদের কাছে নিরুকে ভিক্ষে চাইছি, দেবেন নিরুকে আমার হাতে?

মুহূর্তে বউদিদি যেন কেমন হইয়া গেলেন, স্থির নিস্পন্দ অপলক দৃষ্টি, সে দৃষ্টির মধ্যে যে কত কি ছিল অনুমান করিতে পারি নাই; কিন্তু সে দৃষ্টি বিচিত্র, বিস্ময়কর! দেখিতে দেখিতে ঝরঝর করিয়া তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন। আঁচলে চোখের জল মুছিয়া আমার মাথায় হাত দিয়া মায়ের মত আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, আশীর্বাদ করি বাবা, চিরজীবী হয়ে তুমি আমার দুঃখ ঘোচাও। সন্তানে স্বর্গ দেয় শুনেছি, তুমি আজ আমায় স্বর্গ দিলে! নরু, আজ যে আমার সব দুঃখ তুমি ঘুচিয়ে দিলে!

আমি তাঁহার পায়ের ধূলা লইয়া বলিলাম, আশীর্বাদ করুন, আমার মনের আগুনের আঁচ যেন নিরুকে স্পর্শ না করে।

কই, সে পোড়ারমুখী গেল কোথায়? নিরু, নিরু!

খিড়কির ঘাট হইতে উত্তর আসিল, যাই মা।

বউদিদি তাড়াতাড়ি ঘর হইতে শাঁখ বাহির করিয়া বাজাইয়া তাঁহার জীর্ণ সংসারের মঙ্গলবার্তা ঘোষণা করিলেন।

শাঁখ বাজাচ্ছ কেন মা? আজ কি?

রূপে যৌবনে পরিপূর্ণ শান্ত স্নিগ্ধ একখানি ছবির মত নিরুপমা আসিয়া আমার সম্মুখে দাঁড়াইল। আমাকে দেখিয়া সে ঈষৎ সঙ্কুচিত হইয়া গেল।

বউদিদি বলিলেন, তোমার মুণ্ডুপাত হচ্ছে, পোড়ারমুখী। তোমায় তাড়াবার বন্দোবস্ত হ'ল। পেন্নাম কর নরেশকে, নরেশ তোকে পায়ে ঠাঁই দিয়েছে। ভাগ্যি, তোর ভাগ্যি—কত বড় বিখ্যাত লোক আমার নরেশ!

নিরু প্রণাম করিতে পারিল না, লজ্জায় পলাইয়া গেল।

আমি বলিলাম, দিন একটা দেখিয়ে ঠিক ক'রে ফেলুন বউদি।

তিনি বলিলেন, বউদি কি? মা বল!

দিন স্থির হইয়া গেল পনরো দিন পর।

নিশানাথবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। মনে দ্বিধা ছিল না, ভাল করিলাম কি মন্দ করিলাম—সে কথা ভাবি নাই। সত্য বলিতে গেলে সেদিন মনের মধ্যেও চিন্তার স্থান ছিল না, কল্পনায় রচনা করিতেছিলাম আমার জীবনের ভাবী নীড়। মুহুর্মুহু নিরুর প্রতিচ্ছবি মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিয়া বুকের মধ্যে অপূর্ব একটা শিহরণ উঠিতেছিল।

পুলকিত চিন্তার মধ্যে কখন যে শ্মশানে আসিয়া উঠিয়াছিলাম বুঝিতে পারি নাই। অকস্মাৎ খেয়াল হইল, শ্মশানে আসিয়াছি।

জনহীন বালুকাগর্ভ নদীর উপরেই প্রকাণ্ড উঁচু একটা ঢিবি, চারিদিকে বাবলা ও শ্যাওড়ার জঙ্গল, নীচে ছোট ছোট গুল্ম, তাহারই মধ্যে গ্রামের শ্মশান। স্বল্প-চিহ্নিত পায়ে-চলা একটি পথ যেন বলিতেছিল, মানুষ এখানে বড় একটা আসে না। সেই পথ ধরিয়া ভিতরে গিয়া নিশানাথবাবুর কুঁড়েটা আবিষ্কার করিলাম। ছোট, অতি সঙ্কীর্ণ একখানি কুঁড়েঘর। বোধ করি, তাহার মধ্যে শুইলে দেওয়ালে পা ঠেকিবে। চারিদিকে মড়ার হাড়, মাথার খুলি ইত্যাদি ছড়াইয়া পড়িয়া আছে, কয়টা কুকুর গাছের ছায়াতলে অলস-বিশ্রামে শুইয়া ছিল, ওদিকে দুইটা শৃগাল আমাকে দেখিয়া ছুটিয়া পলাইয়া গেল।

কুঁড়েটার দরজায় গিয়া ডাকিলাম, এই যে, একা ব'সে রয়েছেন?

প্রশ্নটা আমার ভুল হইয়াছিল, কিন্তু ওই প্রশ্নই করিয়াছিলাম।

নিশানাথ হাসিয়া বলিলেন, না, ঐ কোণে আর একজন রয়েছেন। এস।

ভিতরে গিয়া কোণের ব্যক্তিটিকে দেখিবার জন্য দৃষ্টি ফিরাইয়া সভয়ে শিহরিয়া উঠিলাম। একি, এ যে প্রকাণ্ড এক অজগর। পাহাড়িয়া চিতি একটা কুণ্ডলী পাকাইয়া পড়িয়া ছিল।

নিশানাথ হাততালি দিয়া বলিলেন, ভয় করছে তোমার? যা যা, বাইরে যা এখন।

আশ্চর্য, সাপটা ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। আমি সভয়ে সবিস্ময়ে ভাবিতেছিলাম নিশানাথবাবুর ভবিষ্যতের কথা। সে কথা অনুমান করিয়াই বোধ হয় নিশানাথ বলিলেন, আমি হিংসা না করলে ও আমায় হিংসা করবে কেন নরু।

আমি বলিলাম, বলেন কি, সাপকে বিশ্বাস আছে?

নিশানাথ বলিলেন, যুগ-যুগান্তর থেকে সাপ আর মানুষ পরস্পরের হিংসা ক'রে আসছে, মানুষ সাপকে বধ ক'রে, সাপ মানুষকে নাশ করে। কিন্তু কেউ যদি বুঝিয়ে দিতে পারে যে, আমি তার হিংসা করব না—তবে সেও আমার হিংসা করবে না। তুমি তো চোখেই দেখলে; ও প্রায়ই আসে, বর্ষায় তো এইখানেই শুয়ে থাকে।

কিছুক্ষণ পর বলিলাম, কিন্তু হঠাৎ এ রকম—

প্রশ্নটা শেষ করিতে পারিলাম না।

তিনি বলিলেন, রত্নময়ী বসুন্ধরা, নরেশ, তার মধ্যে পরম রত্ন হলেন ভগবান—তাঁকে যদি না পেলাম, তবে পেলাম কি বল?

প্রশ্ন করিয়া ফেলিলাম, কিছু পেলেন?

হাসিয়া তিনি বলিলেন, কিছু মানে কি নরু? অনন্ত অসীম সমুদ্র, সে তো তোমার

বাহুবন্ধনে ধরা দেবে না, তোমাকেই তার বাহুবন্ধনে ধরা দিতে হবে।

বলিলাম, কিন্তু সংসারের প্রতিও তো আপনার একটা কর্তব্য আছে ?

তিনি উত্তর দিলেন, সেখানে আমি স্বার্থপর, সে আমি স্বীকার করি নরেশ ; কিন্তু এ পথ আমার পরিত্যাগ করবার উপায় নেই, কে যেন বিপুল আকর্ষণে আমায় এ পথে টেনে নিয়ে চলেছে।

আমি নীরব রহিলাম।

তিনি আবার বলিলেন, নইলে আমি বলতাম তোমাকে, সংসারে কে কার ? অবশ্য কথাটা সত্য।

এবার বলিলাম, কিন্তু আপনার কন্যা বয়স্থা হয়েছে, তার বিবাহ— অন্তত তার ব্যবস্থা তো আপনার করা উচিত। কত বয়স হ'ল তার জানেন ? উনিশ বৎসর।

নিশানাথবাবু বলিলেন, সে ভারও ওই তাঁর হাতে। সে ব্যবস্থাও তিনি করবেন।

আপনি কি সত্যই তাই বিশ্বাস করেন ?

অন্তরে অন্তরে। এবং আমায় যতটুকু কৃপা তিনি করেছেন, তাতে বুঝতে পারছি, তিনি তার অতি শুভ ব্যবস্থাই করেছেন।

তার মানে ?

আমার কন্যার বিবাহ খুব শীঘ্রই হবে এবং সুপাত্রেই হবে।

অবাক হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। তারপর বলিলাম, আমাকে মার্জনা করবেন, আমি সেই কথাই আপনাকে বলতে এসেছিলাম। আমি নিরুকে বিবাহ করছি, পনরো দিন পরই, অর্থাৎ আঠারোই দিন স্থির হয়েছে।

আশ্চর্য ! সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর চোখেও জল দেখা দিল। পরম স্নেহে আমার মাথায় হাত দিয়া বলিলেন, মঙ্গল হোক তোমার, তুমি সুখী হও।

বলিলাম, বিবাহের ব্যবস্থা তো করতে হবে, এখন যদি কয়েকদিনের জন্যে বাড়িতে যান, তবে বড় ভাল হয়।

তিনি বলিলেন, উপায় নেই, আমার এ আসন ত্যাগ করবার উপায় নেই। সংকল্প ক'রে আসন গ্রহণ করেছি, চার বৎসরের সংকল্প। এক বৎসর হবিষ্যান্ন হয়ে গেছে, এ বৎসর ফল জল, আগামী বৎসর শুধু জল, তারপর নিরম্বু উপবাস, বায়ু মাত্র আহার ক'রে থাকব। তারপর আসন ত্যাগ করব।

আর অনুরোধ করিলাম না, উঠিয়া চলিয়া আসিলাম। শুধু ভাবিতেছিলাম, নিরম্বু উপবাস ! বায়ুমাত্র আহার ! শিহরিয়া উঠিলাম।

চন্দ্রনাথের কথাও বলিলাম না। বোধ হয় বলিতে ভুলিয়াই গিয়াছিলাম। তিনি পিছন হইতে আবার ডাকিয়া বলিলেন, বিয়ের পর নিরুকে নিয়ে একবার এসো, কেমন ?

বলিলাম, আসব বই কি, আপনার আশীর্বাদ ভিন্ন নিরু নতুন জীবনে যাত্রা শুরু করবে কি নিয়ে ?

তাঁর চোখ আবার ছলছল করিয়া উঠিল।

সতেরো

সেই দিনই রওনা হইয়া গিয়াছিলাম হীরুর সন্ধানে।

লুপ লাইনের রামপুরহাট স্টেশনে নামিয়া মোটরবাসে দুমকার পথে যাত্রা করিলাম। শুক্লপক্ষের রাত্রি, সন্ধ্যাতেই জ্যোৎস্না বিকশিত হইয়াছিল। সুদূরবিস্তৃত গৈরিকবর্ণ প্রান্তর জ্যোৎস্নালোকে রহস্যলোকের মত মনে হইতেছিল। ক্ষুদ্র এই ঘরখানির অন্ধকার গর্তের মধ্যে বিস্তৃত আলোকিত প্রান্তর যেন হু হু করিয়া দুই পাশ দিয়া বহিয়া চলিয়াছে। ওই যে শালবন আসিতেছে, ঘনশ্যাম অরণ্যের শিরে প্রসুপ্ত জ্যোৎস্না, যেন আকাশের প্রেম। মাইলের পর মাইল অতিক্রম করিয়া বাসখানা ছুটিয়া চলিয়াছে। একটা গ্রামে বাসওয়ালাটা দাঁড়াইয়া বলিল, আমার গন্তব্য স্থান আসিয়াছে। আমি নামিয়া পড়িলাম। পথের কৌতূহলী কয়েকটি গ্রামবাসীকে জিজ্ঞাসা করিয়া হীরুর কাছারীতে গিয়া উঠিলাম। সম্বর্ধনার ত্রুটি হইল না, কিন্তু হীরুকে পাইলাম না। শুনিলাম, এখান হইতে দশ মাইল দূরে গভীর শালবনের মধ্যে মাচা বাঁধিয়া সে সেখানে বাঘের পথের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছে।

রাত্রে সেখানে যাইবার উপায় নাই, প্রাতঃকালে মোটর যাইবে হীরুকে আনিতে, তখন আমি যাইতে পারি।

সকল ঘরেরই অবারিত দ্বার, অন্যমনস্কভাবেই এ-ঘর ও-ঘর ঘুরিয়া ফিরিতেছিলাম।

চাকরটা বলিল, বিছানা হয়েছে হুজুর ; রাত্রিও অনেক হ'ল।

সত্য কথা, ঘুরিয়াই বা লাভ কি ? আর ঘুরিতেছিলামই বা কেন ?

অকস্মাৎ মনে পড়িয়া গেল যাযাবরীকে।

যাযাবরীকেই আমি অন্যমনস্ক চিত্তে খুঁজিতেছিলাম।

প্রাতঃকালেই মোটরে চড়িয়া বাহির হইয়া গেলাম।

অরণ্যপথে প্রভাতেও নিশাশেষের অন্ধকার শেষ হয় নাই, ঊর্ধ্ববাহু বনস্পতি আলোকের কামনায় আকাশলোকে যাত্রা শুরু করিয়াছে, সমগ্র জীবনেও সে যাত্রার শেষ নাই। অথচ আপনার ছায়ার অন্ধকারে আপনার নিম্নাঙ্গ আবৃত। হায় রে কামনা, হায় রে তৃষ্ণা! কামনার উগ্রতার সঙ্গে সঙ্গে বঞ্চনার ক্ষোভ নিক্তির ওজনে সমান পরিমাণে বাড়িয়া চলিয়াছে।

শেষ রজনীর মত তরল তিমিরে খুঁজিতেছিলাম, কোথায় শুকতারা—হীরু!

ক্রমে ক্রমে তির্যক গতিতে রৌদ্ররশ্মি তীক্ষ্ণ ভল্লের মত অন্ধকারের বুক বিঁধিয়া এখানে ওখানে আত্মপ্রকাশ করিতে আরম্ভ করিল।

বনের মধ্যে ছোট একটি ঝরণা। এ ঝরণা উপর হইতে ঝরে না, মাটির বুক চিরিয়া ছোট একটি ডোবার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে। ঝরণার আশেপাশে স্যাঁতস্যেঁতে, মাটির উপর বড় গাছ নাই, খানিকটা বেশ খোলা, কিন্তু উপরে আকাশ অবারিত, চারিপাশের গাছের ডাল আসিয়া মনোরম একটি আচ্ছাদন প্রস্তুত করিয়াছে। দেখিলাম, প্রকাণ্ড একটা শালগাছের গা ঘেঁষিয়া একটা উঁচু মাচান, ওপাশে আর একটা, কিন্তু হীরু কই ?

সঙ্গের শিকারীটা বলিল, বাবু বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছেন।

উপর দিকে চাহিয়া দেখিলাম, জুতার খানিকটা অংশ দেখা যাইতেছে। মই বাহিয়া উপরে উঠিয়া গেলাম, দেখিলাম, বন্দুক মাথায় দিয়া নিশ্চিন্ত মনে একটি কিশোর ঘুমাইতেছে, ওপাশের মাচায় দেখিলাম হীরুও নিদ্রিত। এ কিশোর আবার কে? হাত ধরিয়া টানিতেই ভ্রম ভাঙিয়া গেল। একি, হাতে যে কঙ্কণ বলয়! সাহেবী শিকারের পোশাক পরিয়া নারী! কোনও ফিরিঙ্গীর মেয়ে বলিয়া বোধ হইল। হাতটা ছাড়িয়া দিলাম। ওদিকে শিকারীর আহ্বানে হীরুর ঘুম ভাঙিয়াছিল, সে মাচানের উপর হইতে বলিল, নরু!

মেয়েটিও উঠিয়া বসিয়া আমার মুখপানে চাহিয়া লজ্জায় রাঙা হইয়া বলিয়া উঠিল, বন্ধু-মানুষ, কবে এল্যান গো?

চমকিয়া উঠিলাম। যাযাবরী! সত্যই তো যাযাবরী! সেই রূপ, সেই কণ্ঠস্বর, সেই মিষ্টি ভাষা, কিছু সংস্কৃত হইয়াছে—এইমাত্র। রহস্য করিয়া বলিলাম, নমস্কার।

সে তাড়াতাড়ি আমার পায়ের ধূলা লইয়া বলিল, ছি ছি ছি, উ কি বলেন গো, আমার যে পাপ হবে! আশীর্বাদ করেন আমাকে।

বলিলাম, কি আশীর্বাদ করব বল? না বললে আশীর্বাদ আমি করব না!

ও মাচায় বসিয়া হীরু ফ্লাস্ক খুলিয়া তরল বহ্নি পান করিতেছিল। পান-শেষে একটা সিগারেট ধরাইয়া বলিল, যাক, আকস্মিক আবির্ভাবের কারণ জিজ্ঞাসা করব না, কিন্তু তোর কুশল তো নরু?

বলিলাম, আমার কুশল, কিন্তু হে কুশলী শিকারী, তোমার শিকার কই?

সে বলিল, সৃষ্টির আদি থেকে যে নারী সর্বযজ্ঞ পণ্ড ক'রে আসছে, সেই নারীই পণ্ড করলে আমার গত রাত্রির মারণ-যজ্ঞ! গভীর রাত্রে এক বাঘিনী এল, সঙ্গে তার তিনটি শিশু, আমি বন্দুক তুলে লক্ষ্য স্থির করছি, এমন সময় চিত্রাঙ্গদা চীৎকার ক'রে উঠল, না, না, মেরো না। মানুষের কণ্ঠস্বর শুনে ক্ষিপ্র গতিতে বাঘিনী শিশুদের নিয়ে পালিয়ে গেল। যাযাবরী বললে কি জানিস? আহা-হা, ওর ছানাগুলির কি হ'ত বল তো?

চিত্রাঙ্গদা, হাঁ, যাযাবরীকে চিত্রাঙ্গদাই বলিব। চিত্রাঙ্গদা মুখ নীচু করিয়া রহিল।

মোটরে চড়িয়া বলিলাম, তোদের নিমন্ত্রণ জানাতে এসেছি। আমি বিয়ে করছি।

উল্লাসে কলরব করিয়া উঠিয়া হীরু বলিল, জয় হোক, জয় হোক। দাঁড় করাও গাড়ি।

বিস্মিত হইয়া বলিলাম, কেন, নাচবি নাকি?

যাযাবরী বলিল, সি নাচব আমি গো বন্ধুনোক। আজ রেতে নাচব বইকি।

হীরু বলিল, শুভ সংবাদে আনন্দ করব না? সুধা পান করব না?

মধ্যপথেই আবার সে সুরা লইয়া বসিল।

আমি একে একে সমস্ত কথা বলিয়া বলিলাম, ভালমন্দ চিন্তা করিনি—

সে বলিল, চিন্তায় আর চিন্তামণিতে অন্ধকার আর আলোর সম্বন্ধ বন্ধু। চিন্তা করতে গেলে মণি পেতে না। মণি যখন পেয়েছ, তখন চিন্তা আর ক'র না। আমি যাব, তোর বিয়েতে আমি যাব।

কাছারিতে ফিরিয়া হীরু বলিল, দাঁড়া, ব্যাধের আবরণ খুলে আসি, পরে তোর বিবরণ শুনব। এগুলো শৃঙ্খলের মত কঠোর বন্ধন ক'রে রেখেছে যেন, একটু স্বচ্ছন্দ হওয়ার প্রয়োজন। না হ'লে উৎসব হবে না।

হীরু চলিয়া গেল।

চিত্রাঙ্গদা মৃদুস্বরে বলিল, কই, আশীর্বাদ করলেন না?

হাসিয়া আবার সেই প্রশ্নই করিলাম, কি আশীর্বাদ করব, বল ?

মুখ নত করিয়া অতি মৃদু অথচ অতি দ্রুত সে বলিল, রাঙা খোকার মা হই যেন।—বলিয়াই সে চলিয়া গেল। চমকিয়া উঠিয়া গমনশীলা নারীকে লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, মন্থর গতিভঙ্গি ; যাযাবরীর অভ্যস্ত সে চাপল্য, সে ক্ষিপ্রতা—ধীর শিথিল একটি পূর্ণতার মধ্যে ডুবিয়া গিয়াছে।

মনে মনে বলিলাম, তাই যদি সত্য হয়, তবে চিত্রাঙ্গদা, তুই যেন বভ্রুবাহনের জননী চিত্রাঙ্গদা হতে পারিস, আমি আশীর্বাদ করছি।

হীরু ফিরিয়া আসিল বোতল ও গ্লাস হাতে লইয়া। আমি হাসিলাম।

হীরু বলিল, বন্ধ বর্বরার সঙ্গে থেকে বর্বর হয়েছি নরু, আদি বর্বর যুগের অভ্যর্থনার প্রথাতেই বন্ধু প্রীতিভাজনের অভ্যর্থনা করব। আমার প্রীতিতে সন্দিহান হ'স নি ভাই, কিন্তু তরল সুরা প্রীতিকে করে গাঢ়, হিম যেমন জল জমিয়ে করে বরফ। কামনা করি, তুই আর নিরু জীবনে যেন জ'মে এক অখণ্ড বরফখণ্ডে পরিণত হতে পারিস।

দেখিলাম, হীরুর মস্তিষ্কে সুরা-প্রভাব ক্রিয়াশীল, তাহাকে অতিমাত্রায় মুখর করিয়া তুলিয়াছে।

সুরা-পরিপূর্ণ কাচ-পাত্র তুলিয়া বলিলাম, তোদের সংসারে আসছে যে নবীন আগন্তুক—

হীরু বিবর্ণ মুখে বলিয়া উঠিল, অভিসম্পাত দিস নি নরু, অভিসম্পাত দিস নি।

বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না। সুরার মত বস্তু অধরের সম্মুখে থাকিয়াও উপেক্ষিত রহিয়া গেল। আমি শুধু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম, বহুক্ষণ পর প্রশ্ন করিলাম, যাযাবরীর প্রেম কি তোকে ধন্য করতে পারে নি হীরু ? তোর কি লজ্জা হচ্ছে ?

হীরু আমার শেষ কথার উত্তর দিল, ভুল বললি ভাই, লজ্জার আবরণ আবিষ্কারের পরে হয়েছে লজ্জার উদ্ভব। আমার জীবন অনাবৃত, লজ্জা আমার জীবনে প্রবেশে অনধিকারী। আমি মৃত্যুর উপাসক, অবশেষ রাখার আমি বিরোধী বন্ধু, আমি আমাকে নিঃশেষ ক'রে যেতে চাই।

বহুক্ষণ নীরবতার পর আমি বলিলাম, কিন্তু আমার প্রথম প্রশ্নের উত্তর তো দিলি না তুই ?

হীরু বলিল, সম্মুখে বিস্মরণী মন্দাকিনীর অমৃতধারা, সুতরাং বিস্মৃতির জন্যে তিরস্কার আমার প্রাপ্য নয়। প্রশ্ন পুনরুত্থাপিত কর বন্ধু।

চিত্রাঙ্গদার প্রেম কি তোকে তৃপ্তি করতে পারেনি ?

হীরু সহজ সরল কথায় উত্তর দিল, না, যাযাবরীতে আমার অবসাদ এসেছে।

বলিলাম, সেকি, এরই মধ্যে তৃষ্ণা মিটে গেল ?

হীরু বলিল, তৃষ্ণা মেটেনি, বিতৃষ্ণা এসেছে বন্ধু। কিন্তু মনে হচ্ছে, তুই ও বস্তুটা আজ পান করবি না প্রতিজ্ঞা করেছিস।

হাসিয়া পান করিতে আরম্ভ করিলাম।

হীরু বলিল, হর-কোপানলে মদন ভস্ম হয়ে হ'ল অতনু। তাতে দেখছি, হরেরই হয়েছে পরাজয় ; পুষ্পতনু অতনু হয়ে দ্বিগুণ শক্তি লাভ করলে। পুষ্পতনুর পুষ্পশরে দেহই হ'ত বিদ্ধ, রক্তমাংসের দেহই হ'ত জর্জর, কিন্তু অতনুর অদৃশ্য শর মনকে করে উতলা, উন্মত্ত। দেহ ক্ষুধিত হ'লে তার তৃপ্তি আছে, কিন্তু মন ক্ষুধাতুর হ'লে বিশ্ব গ্রাস ক'রেও তার পরিতৃপ্তি হয় না। আমার মন ক্ষুধাতুর হয়ে উঠেছে নরু, জীবনের ক্ষয় ভিন্ন সে ক্ষুধাকে জয় অসম্ভব।

দেখিলাম তাহার আয়ত স্নিগ্ধ সেই চোখ আজ এই প্রভাত-সময়েও অদ্ভুতরূপে প্রখর হইয়া উঠিয়াছে।

আমার নিজের শূন্য পান-পাত্রটা আবার ভরিয়া লইয়া বলিলাম, জীবনকে সংযত কর, আমার অনুরোধ, তুই বিবাহ কর হীরু।

হীরু বলিল, সমুদ্রমন্থনে উত্থিত গরল এবং অমৃত—দুইয়ের সংমিশ্রণে সুরার সৃষ্টি নরু, ওতে দেব-দানব উভয়েরই অধিকার আছে। আমার পান-পাত্রটাও ভ'রে দাও বন্ধু, শূন্য রেখো না।

হাসিয়া তাহার পাত্রটিও ভরিয়া দিলাম, সুরা তখন মস্তিষ্ককেও উতলা করিয়া তুলিয়াছিল, বলিলাম, বান্ধবী যাযাবরী অনুপস্থিত কেন হীরু, তুই যাযাবর না হয়ে সে-ই কি বন্দিনী হ'ল?

হীরু বলিল, মনে আছে নরু, যাযাবরীর সুরার প্রতি সে প্রলোভন? সে প্রলোভনও সে ভুলেছে মাতৃত্বের মোহে। মারণ-যজ্ঞেও ওর অবসাদ এসেছে, শিকারেও আর যেতে চায় না। কাল জোর ক'রে তাকে নিয়ে গিয়েছিলাম, কিন্তু যাযাবরী ব্যাধিনী অর্ধ-মাতৃত্বেই আপনাকে হারিয়ে ব'সে আছে, আর্তনাদ ক'রে মৃত্যু-সহচরী বাঘিনীকে বধ করতে দিলে না।

দুই হাত জোড় করিয়া নমস্কার করিয়া বলিলাম, তাকে আমি নমস্কার করি।

সে বলিল, বিতৃষ্ণার মধ্যে বোধ হয় আছে ঘৃণা। ঘৃণা বা রুচির বিকারে যে তৃষ্ণা বিগত হয়, সেই হ'ল বিতৃষ্ণা। আমার বিতৃষ্ণা এসেছে। আমি ওকে আর সহ্য করতে পারছি না। জানিস নরু, যেদিন প্রথম শুনলাম, চিত্রাঙ্গদা হবে জায়া, আমার সন্তানের জননী, সেদিন আমি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলাম, হত্যার সংকল্পও মনে মনে জেগে উঠেছিল।

শিহরিয়া বলিলাম, না না না, এমন কাজ করিস নি হীরু।

হীরু উত্তর দিল, সে কথা আমিই আমাকে শতবার বলি নরু।

কিছুক্ষণ পরে সে আবার বলিল, মুক্তকেশীও যেন সে বস্তুটা অনুভব করে নরু, ও আমাকে আড়াল দিয়ে চলতে চায়। কিন্তু সে অপরাধ আমারও নয়, ওরও নয়। এ হ'ল আদিম—

হীরু নীরব হইল। চিত্রাঙ্গদা সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। ভাবী জননীর মুখের পাণ্ডুরাভা বড় সুন্দর লাগিল।

সে আজ জায়ার মতই বলিল, বেলা যে অনেক হ'ল গো। খাবার যে হিম হয়ে গেল।

উঠিয়া পড়িলাম।

স্নান করিতে করিতে মনে পড়িল, চন্দ্রনাথের কথা কিছু বলা হয় নাই। মনে মনে নিজেকেই অভিযুক্ত করিয়া তাড়াতাড়ি স্নান সারিয়া বাহিরে আসিয়া হীরুর সন্ধানে গেলাম। ঘরে ঢুকিতে গিয়া ঢুকিতে পারিলাম না, দেখিলাম, হীরুর বাহুবন্ধনের মধ্যে চিত্রাঙ্গদা ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে।

তবে কি যাযাবরী সব শুনিয়াছে?

উঃ, যাযাবরীরও সে কি উচ্ছ্বসিত কান্না! দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিয়া ফিরিয়া আসিলাম, তখনও সে কান্না তাহার শেষ হয় নাই।

অপরাহ্ণে আর ভুলিলাম না, হীরুকে চন্দ্রনাথের কথা বলিলাম।

হীরু বলিল, দান ক'রে চন্দ্রনাথকে খাটো করবো না। তবে আমি আমার কলিকাতার অ্যাটর্নিকে চিঠি লিখছি, তারা যেন কারখানাটা কিনে নেয়। কিন্তু চন্দ্রনাথ কি আমার

সঙ্গে ওয়ার্কিং পার্টনার হিসেবে কাজ করবে নরু ?

আমি বলিলাম, সে ভার আমার ওপর।

হীরু বলিল, ভার কাঁধে তুলে বহন ক'রে নিয়ে গেলেই সে সার্থক হয় না বন্ধু। দেখো যেন ব্রজরাখালদের সুদূর ব্রজধাম থেকে বাহিত ফলভার যেমন দ্বারকার দ্বারে দ্বারীর হাতে লাঞ্ছিত হয়েছিল, তেমনই লাঞ্ছনা সার না হয়। এক কাজ কর না, তোর বিয়েতে তাকে আসতে লেখ না।

যুক্তিটা বড় ভালো লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে সেই দিনই তাহাকে চিঠি লিখিয়া অনুরোধ করিলাম, মীরা এবং খোকাকে লইয়া আসিতেই হইবে। শুধু আমার নয়, নিরুরও অনুরোধ।

তারপর ?

তারপর স্মরণেও চিত্ত ব্যথিত হইয়া উঠিতেছে। শুধু ব্যথা নয়, বিস্ময়ে, আনন্দে ধরিত্রীর রূপ সেদিন দৃষ্টির সম্মুখে অপরূপ হইয়া উঠিয়াছিল।

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া দেখিলাম, যাযাবরী নাই।

চিত্রাঙ্গদা কোথায় চলিয়া গিয়াছে।

হীরু বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল, বর্বরা আপন সংস্কার অনুযায়ী কাজই করেছে নরু। কাল বোধ হয় আড়াল থেকে সব শুনেছে। শুনে সন্তানের মমতায় আদিম যুগের মায়ের মতই সন্তানের পিতাকে পরিত্যাগ ক'রে চ'লে গেছে ; কিন্তু ভাবছি, সে নিরাপদে পৌঁছবে তো ? উঃ, কাল সে কি কান্না তার আমার বুকে মুখ লুকিয়ে ? তখন বুঝিনি, বিদায়ব্যথা নিঃশেষে সে নিবেদন করছে আমার কাছে !

আমার চোখের সম্মুখে যুগ-যুগান্তরের অতীত কালের ধরিত্রীর রূপ যেন ভাসিয়া উঠিল। কল্পনায় দেখিলাম, সৃষ্টির সাধনায় ধরিত্রী নব নব রূপের মধ্য দিয়া বর্তমান রূপে আসিয়া উপনীত হইয়াছে। আবার কত রূপান্তর হইবে। এ কামনা ধরিত্রীর তপস্যা। এত সুখ, এত সম্পদ, হীরুর মত প্রিয়তমকে পরিত্যাগের মধ্যে যাযাবরীর সেই তপস্যাকে প্রত্যক্ষ দেখিলাম। সেদিন যাযাবরীর কামনাকে প্রণাম করিয়াছিলাম, আজও অন্ধকারের মধ্যে তাহার সাধনাকে প্রণাম করিতেছি।

হীরুও একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—সে আমায় মুক্তি দিয়েছে।

সেই দিনই চলিয়া আসিলাম।

নিরুকে বিবাহ করিলাম।

নিরুর মা-ই কন্যা সম্প্রদান করিলেন ; নিশানাথবাবুর আসন ত্যাগের উপায় নাই। হীরু ও চন্দ্রনাথকে প্রত্যাশা করিয়াছিলাম ; কিন্তু তাহারা কেহ আসে নাই।

চন্দ্রনাথ একখানা রেজিস্ট্রি পত্র দিয়াছিল, তাহার মধ্যে হাজার টাকার একখানা চেক। আর একখানা চিঠি, নিরুকে আশীর্বাদ।

হীরু চিঠিও দিল না, বিবাহের দিন হীরুর ম্যানেজার লইয়া আসিলেন একরাশি অলঙ্কার ও নানা উপহার। হীরু কলিকাতা হইতে পাঠাইয়াছে।

বিবাহের পর নিরুকে লইয়া নিশানাথবাবুকে প্রণাম করিতে গেলাম। নিরুর মা কিছুতেই গেলেন না। বলিলেন, না, তার তপস্যায় বিঘ্ন হবে। শুধু আজ নয়, যদি আমি মরি নরু, তবে তাঁকে আমার মরা মুখও যেন দেখানো না হয়। আমি আর অনুরোধ করিলাম না।

শুধু গোপনে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলাম।

হায় নারী! হায় রে অভিমান!

নিশানাথবাবু সজল চক্ষে আশীর্বাদ করিলেন। ফিরিবার সময় বার বার ফিরিয়া দেখিলাম, সন্ন্যাসী আপন কুটীরদ্বারে দাঁড়াইয়া আমাদের দেখিতেছেন।

নিরুর কান্নার বিরাম ছিল না।

অকস্মাৎ একদিন হীরু আসিয়া উপস্থিত হইল। আসিয়াই বলিল, তোর বউ দেখাবি না?

সাদরে আহ্বান জানাইলাম, আয়, আয়।

নিরু হীরুকে প্রণাম করিল। হীরু চঞ্চল হইয়া উঠিল।

নিরু বলিল, জল খেতে হবে কাকা। সে আপন সম্বন্ধ ধরিয়া হীরুকে কাকা বলিয়া সম্বোধন করিল।

হীরু বলিল, নিশ্চয় খেতেই হবে। কিন্তু শুধু এক গ্লাস জল।

তারপর বলিল, বিদায় নিতে এসেছি।

সে কি?—বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিলাম।

আয়ুসূর্য অস্ত যাবার সময় হয়েছে। পশ্চিম দিগন্তে অভিযান না ক'রে উপায় কি? ইউরোপ চলেছি। ডাক্তারেরা সন্দেহ করেছে, টি. বি.।

টি. বি.?

হ্যাঁ। কিন্তু চন্দ্রনাথের ওখানে গিয়ে ব্যবস্থাটা ক'রে ফেল।

আমি ব্যাকুল হইয়া বলিলাম, তুই কিন্তু নিজেকে সংযত কর হীরু।

সে হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। তারপর বলিল—

"বহ্নি যবে বাঁধা থাকে তরুর মর্মের মাঝখানে
ফুলে ফলে পল্লবে বিরাজে।
যখন উদ্দাম শিখা লজ্জাহীনা বন্ধন না মানে
মরে যায় ব্যর্থ ভস্ম মাঝে।"

বুকের বহ্নি জ্বলেছে বন্ধু, লজ্জাহীনা তার শিখা, ভস্ম যে হতেই হবে। নেভানো তাকে যাবে না।

না না, সুইজারল্যাণ্ডে গেলেই ভাল হবে। ভাল ডাক্তার দেখে—

সে আবার হা-হা করিয়া হাসিয়া বলিল, খুব ভাল ডাক্তার ঠিক করেছি বন্ধু—, নারী নারী নারী। আমি পশ্চিম জয় করতে চলেছি।

আমি অবাক হইয়া তাহার পানে চাহিয়া রহিলাম।

সে উঠিয়া বলিল, চললাম। আমি আর বসব না।

সে চলিয়া গেলে আমার চেতনা ফিরিল। তখন তাহার প্রকাণ্ড বড় মোটরখানা পশ্চাতে ধূলা ও ধোঁয়ার যবনিকা তুলিয়া দিয়া জনসমুদ্রের মধ্যে মিশিয়া গিয়াছে।

বহুক্ষণ ব্যর্থ চিন্তার পর মনে পড়িল চন্দ্রনাথকে। সেই এক ক্ষ্যাপা—সারা জীবন পরশপাথর খুঁজিয়া ফিরিতেছে।

আঠারো

পরদিনই রওনা হইয়া গেলাম চন্দ্রনাথের উদ্দেশে।

যখন স্টেশনে নামিলাম, তখন অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে। একখানা গরুর গাড়ি ভাড়া করিয়া চন্দ্রোদয়ের অপেক্ষায় একটা পাথরের উপর বসিয়া রহিলাম। গ্র্যাণ্ড-কর্ড লাইনে গাড়ির যাওয়া-আসার বিরাম নাই—পণ্য-সম্ভার, কয়লা, অভ্র, কাঠ, ফায়ার-ক্লে ইত্যাদি বোঝাই করিয়া মালগাড়ি একটা যায়, একটা আসে। ট্রেনের গতিবেগে পৃথিবীর বুক অবিরাম থরথর করিয়া কাঁপে। হুইসলের তীক্ষ্ণ চীৎকার বন্দুকের গুলির মত নৈশ স্তব্ধতার বুক ভেদ করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। টেলিগ্রাফ-পোস্টগুলা হইতে বায়ুপ্রবাহ-স্পর্শে একটা বিরামহীন শব্দ—ক্ষুব্ধ গর্জন-ধ্বনির মত ধ্বনিত হইতেছে। সম্মুখে দূরে সারি সারি সিগ্‌নালের লাল আলো অকম্পিত জ্যোতিতে জ্বলিতেছে। পিছনের দিকে চাহিলাম, সেখানেও তাই; যেন কাহার আরক্ত দৃষ্টি ধকধক করিয়া নিষ্পলক চক্ষে জাগিয়া আছে।

গাড়োয়ানটা আসিয়া চিন্তার ব্যাঘাত করিল, বলিল, হুই বাবু চাঁদ দেখাইছে, পলাশবনের হুই মাথাতে।

গাড়িতে উঠিয়া বসিলাম। মন্থর গমনে গাড়িটা চলিয়াছিল। পাশে একটা কয়লা-নিঃশেষিত পরিত্যক্ত কয়লা খনির সুদীর্ঘ চিমনিটা সদ্যবিকশিত অস্ফুট জ্যোৎস্নার মধ্যে আমার অদ্ভুত বলিয়া মনে হইল; কে যেন একটা আঙুল বসুন্ধরার বুকের মধ্যে প্রখর নখ দিয়া ভেদ করিয়া বসাইয়া দিয়াছে—কোন রক্তলোলুপ দানব।

সেই দিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া সম্মুখ-দিগন্তে প্রসারিত করিলাম। পূর্ব-দক্ষিণ কোণে দূর দিগন্তে সুদীর্ঘ এক অগ্নিরেখা জ্বলিতেছে, দিগন্তের আকাশ পর্যন্ত রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। গাড়োয়ানটাকে প্রশ্ন করিলাম, ওটা কিসের আলো রে?

উটা আলো লয় আজ্ঞা, আগুন; পাহাড়ের শালবনে আগুন লেগেছে আজ্ঞা।

বনে আগুন লাগিয়াছে! সেই দিকেই চাহিয়া রহিলাম।

গাড়োয়ানটা তখনও বলিতেছিল, দিনরাত জ্বলছে, দিনরাত জ্বলছে। খেয়ে শেষ করবেক, তবে থামবেক। দিনরাত জ্বলছে।

গাড়িটা বড় রাস্তা হইতে মোড় ফিরিল। বনের আগুন পিছনে পড়িয়া গেল। কিন্তু একি, চন্দ্রনাথের কারখানার আগুন কই? নিষ্কম্প জ্যোৎস্না মাথায় করিয়া ঘন পলাশবন অন্ধকারের মত পড়িয়া আছে। কোথায় ধূমকেতুকেতন চন্দ্রনাথের বহ্নিধ্বজা, চিমনির মুখে লেলিহান অগ্নিশিখার সারি? মন শঙ্কিত হইয়া উঠিল।

শঙ্কা আমার মিথ্যা নয়। গিয়া দেখিলাম, কারখানাটা পরাজিত দৈত্যপুরীর মত স্তব্ধ, যন্ত্রপাতিগুলা বজ্রাহত বৃত্রাসুরের কঙ্কালের মত পড়িয়া আছে।

কোথায় চন্দ্রনাথ?

তাঁহার অসমাপ্ত মণিমন্দির অন্ধকার। চন্দ্রনাথ নাই, মীরাও নাই। অবশেষে দেখা হইল হীরুর অ্যাটর্নির প্রতিনিধির সঙ্গে। তিনি বলিলেন, চন্দ্রনাথবাবু আমরা পৌঁছিবার আগেই মাড়োয়ারীকে কারখানা বিক্রি ক'রে চ'লে গেছেন। কোথায় গেছেন, সেও কাউকে ব'লে যান নি। অদ্ভুত মানুষ! শুনলাম, ব'লে গেছেন, এ আমার অজ্ঞাতবাস!

আমি স্তব্ধ হইয়া আকাশের দিকে চাহিয়া খুঁজিতেছিলাম, কোথায় কালপুরুষ !

*　　　*　　　*　　　*

ছায়াপট ছায়াঘন হইয়া উঠিল যে।

কে কোথায় ? চন্দ্রনাথ, মীরা, হীরু, যাযাবরী—কই, কোথায় ?

একি, অন্ধকার ঘরের মধ্যে বিভীষিকার মত ওকি মূর্তি ! স্পন্দনহীন, চর্মাবৃত কঙ্কাল—ও কে ?

মনে পড়িয়াছে।

বৎসর দুয়েক পর একটা টেলিগ্রাম পাইলাম, "নিশানাথবাবু মৃত্যুশয্যায়, নিরুকে লইয়া অবিলম্বে এস।"

অবিলম্বেই নিরুকে লইয়া রওনা হইলাম।

নিশানাথবাবু আপনার উগ্র কামনায় সেই ব্রত অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়া চলিয়াছিলেন। হবিষ্যান্ন এক বৎসর, পর-বৎসর ফল জল, তারপর এক বৎসর সামান্য দুধ ও জল খাইয়া কঠোর উপাসনা করিয়াছেন। শুধু বায়ু মাত্র আহার করিয়া বৎসর যাপনের এই প্রারম্ভ।

নিরু কাঁদিতেছিল, তাহাকে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিলাম না। সন্ধ্যার প্রাক্কালে দেশে গিয়া পৌঁছিলাম।

শ্মশান নগর হইয়া উঠিয়াছে। নিশানাথের উদগ্র ক্ষুধাকে বেষ্টন করিয়া মানুষ ক্ষুধার হাট গড়িয়া তুলিয়াছে। শ্মশানভূমির চারিপাশে বসিয়া গিয়াছে মেলা।

আমাদের গ্রামেরই দোকানদার ধর্মদাস আমাকে দেখিয়া প্রণাম করিয়া হাসিয়া বলিল, এই যে, আপনি এসে পড়েছেন ! তা এ দেখবার জিনিস মশায়। কেউ যদি একবিন্দু জল মুখে দিতে পারলে ! আর জ্যোতি কি হয়েছে দেহের !

আমি নীরবে চারিদিকের জনতার দিকে চাহিয়া দেখিতেছিলাম।

ধর্মদাস বলিল, এ আর কি লোক দেখছেন, সন্ধ্যে হ'লে লোকে লোকে পথ চলা যাবে না ! দোকানদাররা সব লাল হয়ে গেল, কি বিক্রি মশায় ! আরো ভেতরে যান, দেখবেন, পয়সার রাশি ! বাতাসা আর মিষ্টির পাহাড় হয়ে গিয়েছে !

ভিড় ঠেলিয়া অতি কষ্টে শ্মশানের অভ্যন্তরের কুঁড়ের সম্মুখে গিয়া উঠিলাম। কিন্তু কোথায় সে কুঁড়ে, কোথায় সে শ্মশান ? ফুলে পাতায়, চিত্র-বিচিত্র সামিয়ানায় সেখানে এক উৎসব-মণ্ডপ গড়িয়া উঠিয়াছে। কুঁড়েটি এখনও আছে, কিন্তু তাহার চারিপাশে আরম্ভ হইয়াছে পাকা মন্দিরের বনিয়াদ।

ভিতরে গেলাম। দেখিলাম, চর্মাবৃত কঙ্কালমূর্তি নিশানাথ স্পন্দনহীনপ্রায় নিমীলিত নেত্রে এখনও ধ্যানাসনেই বসিয়া আছেন, চোখেও বোধ করি দৃষ্টি নাই। জীবনের লক্ষণের মধ্যে বক্ষঃস্থল তখনও ধুঁকিতেছে। তাঁহার একটু দূরে বসিয়া নিশানাথবাবুর স্ত্রী এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাহিয়া আছেন। লক্ষ্য করিলাম, তাঁহার আসন ভিন্ন।

নিরু কাঁদিয়া মায়ের কোলে লুটাইয়া পড়িল। চারিদিক হইতে রব উঠিল, কেঁদো না, কেঁদো না।

একজন কে বলিল, ছি মা, তোমার মত দেবতা বাপ হয় কজনের ? দেবতার তপস্যায় কি কেঁদে বিঘ্ন করতে হয় ?

আমাকে দেখিয়া নিরুর মা এক বিষাদাচ্ছন্ন ভঙ্গিতে অভ্যর্থনা করিয়া ইঙ্গিতে বসিতে

বলিলেন। কয় ফোঁটা জল তাঁহার চোখ হইতে ঝরিয়া পড়িল।

তাঁহাকেই বলিলাম, একটু কিছু মুখে দিয়ে দেখেছেন?

ম্লান হাসি হাসিয়া তিনি মৃদুস্বরে বলিলেন, ভগবান এসে দেখা না দিলে সে হবার নয়; আর আমার স্পর্শ করবারও উপায় নেই।

আর প্রশ্ন করিলাম না, নির্নিমেষ নেত্রে অদ্ভুত মানুষটির দিকে চাহিয়া রহিলাম। মনে হইল, ঠোঁট যেন ঈষৎ নড়িতেছে। বলিলাম, কিছু বলছেন ব'লে মনে হচ্ছে!

নিরুর মা বলিলেন, ভেতরে জ্ঞান তো রয়েছে।

আরও একটু অগ্রসর হইয়া নিশানাথবাবুর অতি সন্নিকটে গিয়া বসিলাম। সমস্ত দিন সমস্ত রাত্রি গভীর অভিনিবেশ সহকারে শুনিয়া সে কথাটি বুঝিয়াছিলাম—অতি ক্ষীণ অস্ফুট স্বরে উচ্চারিত হইতেছিল তাঁহার ইষ্টদেবতার বীজমন্ত্র।

পরদিন ব্রাহ্মমুহূর্তে নিশানাথের বক্ষ-স্পন্দনটুকুও শেষ হইয়া গেল। মানুষ তবু মৃত্যুতে বিশ্বাস করিল না। তাঁহার দেহ তেমনই অবস্থাতেই সমস্ত দিন থাকিয়া গেল। অবশেষে সন্ধ্যার সময় মহাসমারোহে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ হইল।

সেদিন মেলাতে সে কি জনতা! দোকানীরা পরমোৎসাহে কণ্ঠ বিদীর্ণ করিয়া মহাপুরুষের জয়ধ্বনি দিতেছিল।

একেবারে মেলার একপ্রান্তে বেশ্যাপল্লীতেও উচ্ছৃঙ্খল চীৎকারের বিরাম ছিল না।

পৃথিবীর এক বিচিত্র রূপ আমার চোখের উপর ভাসিয়া উঠিল।

মন্দির-মসজিদ-গির্জা-স্তূপ-সঙ্ঘারামের মিনার-গম্বুজ-কণ্টকিত ধরিত্রী!—ঊর্ধ্বনেত্র ঊর্ধ্ববাহু যুগ-যুগান্তরের কোটি কোটি মানুষ শোভাযাত্রা করিয়া আকাশের পথে চলিতে চাহিতেছে।

উনিশ

তারপর?

স্মৃতির কত পাতা উল্টাইয়া গেলাম। চন্দ্রনাথ মীরা নাই, হীরু যাযাবরী নাই, আপনার কাজকর্মে মগ্ন হইয়া জগতের গতির সঙ্গে চলিয়াছি। আমার জীবন-তারকা অস্তোন্মুখ—সাহিত্য জগতে নামিতে শুরু করিয়াছি। খ্যাতি কমে নাই, বরং অর্থ, অভিনন্দন, সম্মান পর্যাপ্ত পরিমাণে পাইতেছি। কিন্তু ওইখানেই তো ওই ইঙ্গিত আমি দেখিতে পাই। বিধাতা যেন আমার হিসাব-নিকাশ চুকাইতে বসিয়াছেন। পাওনা শেষ হইলেই তো হিসাব চুকিয়া গেল।

গত বৎসর হাওড়ায় একটা সভার নিমন্ত্রণ সারিয়া বাড়ি ফিরিতেছিলাম। বেলা তখন সাড়ে পাঁচটা। লালদীঘির কাছে আসিয়া গাড়ির গতি মন্দ হইল। ট্রাম, বাস, মোটর, রিক্শ, গৃহাভিমুখী শ্রান্ত কেরানীদলের ভিড় ঠেলিয়া গাড়িখানা চলিতেছিল ধীরে ধীরে। রাইটার্স বিল্ডিংয়ের সম্মুখেই ফুটপাতের উপর হঠাৎ চন্দ্রনাথকে দেখিলাম। গাড়ি রাস্তার ধারে ভিড়াইতে বলিয়া গাড়ি হইতে নামিয়া গিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিলাম, চন্দ্রনাথ!

ঈষৎ হাসিয়া সে বলিল, নরু!

বলিলাম, হ্যাঁ, কিন্তু এখানে নয়, আমার গাড়িতে আয়। আমার ওখানে যেতে হবে।

নিরুর সঙ্গে দেখা করবি।

অল্প একটু চিন্তা করিয়া সে বলিল, আমার এখন অজ্ঞাতবাস। এখনও নিজেকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করতে পারিনি। কিন্তু তোর ওখানে—আচ্ছা চল, নিরুকে দেখে আসব।

গাড়িতে উঠিয়া প্রথমেই তাহাকে প্রশ্ন করিলাম, মীরা কেমন ?

সে বলিল, মধ্যে সে পাগল হয়ে গিয়েছিল, সূত্রপাত বোধ হয় তুই দেখে এসেছিলি, নয় !

বলিলাম, হ্যাঁ, সেই তোর সঙ্গে শেষ দেখা।

চন্দ্রনাথ বলিল, তারপর উন্মাদ হয়ে গিয়েছিল। শুধু নাচত, গান না, শব্দ না, চীৎকার না, শুধু নাচত। কখনও কখনও কাঁদত, তাও নিঃশব্দে ফুলে ফুলে। এমনও হয়েছে, নাচছে অথচ চোখ দিয়ে জলের ধারা বইছে।

ব্যগ্রভাবে প্রশ্ন করিলাম, এখন ?

সে উত্তর দিল, এখন মন্দের ভাল, এখন আর নাচে না বা কাঁদে না, বুদ্ধিভ্রংশ হয়ে শান্ত হয়ে আছে। ভেবেছিলাম, অ্যাসাইলামে পাঠিয়ে দোব। কারণ, তখন আমার মুহূর্তের অবসর ছিল না। কারখানাটা বেচে ফেললাম। নতুন স্টার্ট নেবার জন্যে আমিও তখন উন্মাদ বললেই হয়। সে সময় মীরাকেও যেন সহ্য করতে পারছিলাম না। শেষে চ'লে এলাম কলকাতায়। সামান্য কয়েক হাজার টাকা মাত্র সম্বল। স্থির করলাম, যাদুমন্ত্রে তাকে অসামান্য বৃহৎ ক'রে তুলতে হবে ; শেয়ার মার্কেটে স্পেকুলেশন করব। এখানে এসে দিনকতক মার্কেটের অবস্থা এবং গতি লক্ষ্য করবার জন্যে প্রায় ছয় মাস নিষ্ক্রিয় হয়ে ব'সে ছিলাম। শুধু খবরের কাগজ থেকে বাজারের ইতিহাস নোট ক'রে রাখতাম, মধ্যে মধ্যে বেরুতাম খবরাখবরের জন্যে। সেই সময় অহরহ মীরাকে আমার কাছে বসিয়ে রাখতাম। সেই শাসনে, আর একটা চিকিৎসাও করিয়েছিলাম, সেই চিকিৎসায় ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে এল। এখন কাজকর্ম করে কলের মত এই পর্যন্ত। বুদ্ধিভ্রংশ হয়ে গেছে।

গাড়িখানা এস্‌প্লানেডের মধ্যে দিয়া চলিয়াছিল। আমি নীরবে মীরার কথাই ভাবিতেছিলাম।

চন্দ্রনাথ বলিল, রোখো গাড়ি।

প্রশ্ন করিলাম, কেন ?

সে বলিল, না নরু, আমি যেতে পারব না। আমার মর্যাদায় ঘা লাগছে। জানি, এ নিতান্ত অহেতুকী, কিন্তু তবুও না। তোর এখন বিপুল প্রতিষ্ঠা, তোর ওখানে কত লোক থাকবেন হয়তো। কি পরিচয় দোব আমি ? শুধু তোর বন্ধু ব'লে ! না না, সেই কি আমার পরিচয় ? না !

তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলাম, তবে চল তোর বাড়ি যাই।

এক মুহূর্ত কি ভাবিয়া সে বলিল, বেশ। কিন্তু মোটর ছেড়ে দাও। ট্রামে যেতে হবে আমার সঙ্গে। আমি ভাড়া দোব।

তাহাতেই রাজি হইলাম। গাড়ি হইতে নামিয়া বলিলাম, নিউ মার্কেট হয়ে যাব কিন্তু, কিছু ফুল কিনব।

সে হাসিয়া বলিল, মীরার জন্যে ? বেশ, চল।

পদব্রজে চলিতে চলিতে প্রশ্ন করিলাম, তোর নিজের বিজনেস কেমন এখন ?

চন্দ্রনাথ বলিল, এ হ'ল এক রকম জুয়োখেলা। এ ধরনের কাজ আমি পছন্দ করি না। জীবনে আমি কখনও লটারির টিকিট কিনি নি। যার জন্যে পরিশ্রম করলাম না, তার জন্যে

আবার পাওনা কি? 'গ্রোথ অব দি সয়েল'-এর কল্পনা আমার জীবনে স্বপ্ন। কিন্তু জীবনে আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে, তাই ইচ্ছে আছে, এবার শুধু লোহার কারখানা আমি করব। লোহার কারখানায় মূলধনটা বড় বেশি প্রয়োজন।

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া আবার বলিল, দেখ, জীবনে দুর্বলতা আসছে ব'লে মনে হচ্ছে। এক এক সময় ভাবি, না, ওসব আর নয়। 'গ্রোথ অব দি সয়েল'-এর স্বপ্ন থাক, বিরাট কর্মক্ষেত্র রচনা এ জীবনে আর হ'ল না। সময় কোথায়? শুধু কামনা করি, ঘর-বাড়ি, সুখ-সম্পদ, প্রচুর সম্পদ। কিন্তু তবু মনকে বোঝাতে পারি না। 'গ্রোথ অব দি সয়েল'-এর স্বপ্নে আমার মন পাগল।

মার্কেটে আসিয়া ফুলের দোকানে ঢুকিয়া বাছিয়া বাছিয়া রক্তরাঙা ফুল ঝুড়িতে তুলিয়া রাখিতেছিলাম। ফুলের ঝুড়ি সাজাইয়া লইয়া ভাবিলাম খোকার জন্য কিছু খেলনা কিনিয়া লইব। সম্মতির জন্য চন্দ্রনাথকে সে কথা বলিতে গেলাম, কিন্তু কোথায় চন্দ্রনাথ? সে সেখানে ছিল না। বেশ বুঝিলাম, সে চলিয়া গিয়াছে, চোরের মত পলাইয়াছে। তাহাকে পাইব না জানিয়াও খুঁজিলাম, কিন্তু পাইলাম না।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বাড়ি ফিরিতেছিলাম। ভাবিতেছিলাম, এ ফুল লইয়া কি করিব? পথে হঠাৎ চোখে পড়িল সার্কুলার রোডের সমাধি-ক্ষেত্রটা। কি মনে হইল, সমাধি-ক্ষেত্রের মধ্যে ঢুকিয়া সম্মুখের একটা কবরের উপর ফুলগুলি সযত্নে সাজাইয়া দিলাম।

চন্দ্রনাথের নয়, হীরুর নয়। কল্পনা করিলাম, ওই সমাধিই মীরার সমাধি। চন্দ্রনাথ বা হীরুর সমাধি আমি কল্পনা করিতে পারি না। তাহাদের অন্তিম কল্পনা করিতে গেলেই মনশ্চক্ষে ভাসিয়া উঠিতেছে—চিতা, সেই পঞ্চকোটের শালবনটা দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে।